অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

অর্থনীতিশাস্ত্রে
দর্শনের দারিদ্র্য

অর্থনীতিশাস্ত্রে
দর্শনের দারিদ্র্য

আবুল বারকাত

মুক্তবুদ্ধি
প্রকাশনা

একটি মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা

অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য
Poverty of Philosophy in Economics

প্রথম প্রকাশ: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা মার্চ ২০১৭
স্বত্ব ২০১৭ © আবুল বারকাত
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার ষষ্ঠ গ্রন্থ

বাংলাদেশে আবুল বারকাত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত

প্রকাশক
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে
আবুল বারকাত
বাড়ি নং ৫, রোড নং ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
(ফোন নং: ৮১১৬৯৭২, ০১৯৭৭৯৯২২৬৮; ০১৭৫৬১৪২৩১৫)
ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
এই গ্রন্থের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

ISBN : 978-984-34-2467-9

মূল্য: ৩৫০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ইউকে ৩০ পাউন্ড, ইউরোপ ২৫ ইউরো

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০১৭), অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য।
ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

আমার পেশাগত জীবনের
পরিচয়ের মূল অবস্থান-সূত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার
অর্থনীতি বিভাগকে

মুখবন্ধ

আমাদের এই কর্তাভজা দেশে চিন্তার ক্ষেত্রেও কর্তার ভূত আমাদের ঘাড়ে আচ্ছা করে চেপে বসে আছে। ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন দেশ হয়েও আমাদের বেশির ভাগ তথাকথিত চিন্তকদের মন এখনও পরাধীন। সাম্রাজ্যবাদী ও নব-উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের ধামাধরা পণ্ডিতদের চিন্তার বেড়ি পরে আমরা নিত্যই ঠুলি-পরা কলুর বলদের মতো কাজ করে যাচ্ছি।

এ ক্ষেত্রে একটি বিরাট ব্যতিক্রমী মানুষ আমার যুগপৎ পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র প্রফেসর ড. আবুল বারকাত। ১৯৮৪ সনের সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ করছি তার শাণিত বুদ্ধি, আত্মিক একাগ্রতা, নৈতিক সততা এবং দ্বান্দিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ভিতর দিয়ে নিরলসভাবে সত্যের অনুসন্ধান। তারই অনেক সোনালী ফসলের একটি এই তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্লেষণে ভরপুর, মৌলিকভাবে তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রাগ্রসর বইটি।

এ গ্রন্থে বারকাত শুধু যে বিদ্যমান অর্থনীতিশাস্ত্রের সৎ ও বিদগ্ধ আলোচনা করেছেন, তা নয়। তিনি নিষ্ঠার সাথে ইবনে খালদুনের মতো ভুলে-যাওয়া অবহেলিত পণ্ডিতদের টেনে এনেছেন গবেষণার আলোয় উজ্জ্বলতর করে। আমরা জানতে পারছি মার্ক্সের বিমূর্ত শ্রম কেন এত জরুরি ধারণা। সর্বোপরি অর্থনীতির কোন পথে আসবে সকল মানুষের মুক্তি, তার একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সুস্পষ্ট ধারণাও আমরা পেয়ে যাচ্ছি। একেবারে শেষে নতুন প্রজন্মের জন্য কোন ধরনের অর্থনীতি-শিক্ষা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে, সে আলোচনার সূত্রপাতও করা হয়েছে।

বারকাতের বইটিতে সবার উপরে সাম্রাজ্যবাদের যুগ থেকে একবিংশ শতকের পুঁজিবাদের পরবর্তী সম্ভাব্য স্তরে – যদি তত দিনে পুঁজিবাদের পরিবেশ-দূষণ ও আগ্রাসী যুদ্ধবিগ্রহে মানবসমাজ ধ্বংস না হয়ে যায় – অগ্রসর হওয়ার জন্য বন্ধ্যাত্ব থেকে চিন্তার মুক্তি এবং প্রাসঙ্গিক প্রায়োগিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। লেখক ঠিকই ধরেছেন এবং লিখেছেন যে একক এবং যৌথ বিভিন্ন প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েই এই শুভ সংগ্রামের পথ তৈরি হবে। আমরা যারা এ পথের পথিক হতে চাই, তাদের সকলেরই বারকাতের এই দ্বিধাহীন বহুমুখী সংগ্রামের ডাকে সাড়া দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

আমি এই তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ উচ্চমানের গবেষণাগ্রন্থের বহুল প্রচার আন্তরিকভাবে কামনা করি।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

হায়দার আলী খান, পিএইচডি
জন্ ইভান্স ডিস্টিংগুইসড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়
জোসেফ করবেল স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ
ডেনভার, কলোরাডো
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সূচিপত্র

মুখবন্ধ
কৃতজ্ঞতা ৮

অধ্যায় ১. ভূমিকা: এ গ্রন্থে কী নিয়ে ভাবনা ১০

২. কিছু নির্যাস কথা ১৪

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ: সম্পদের উৎস **কী?** কে সম্পদ সৃষ্টি করে? কোথায়, কোন খাত-ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি হয়? **১৫**

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ: বাজার ব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য' নাকি বাজারে সম্রাট-রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ থাকতে হবে? **১৬**

৩. অর্থনীতিশাস্ত্রে কে- কী-কেন বলেন? সহজিয়া কথা ২২

৪. অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল ধারাসমূহ: শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের স্বরূপ ২৯

৫. নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদ: সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাসত্বের 'নগ্ন দর্শন' ৫১

৬. অন্যের মৌলিক অবদান স্বীকার না করার দারিদ্র্য: অর্থনীতিশাস্ত্রীদের "মননের দারিদ্র্য" ৬৪

৭. অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য': কী দাঁড়াল? কী করা? ৭২

উপসংহার নিয়ে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ৭২
অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য: মর্মকথাটা দাঁড়াল **কী?** ৭২
বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় রোধে অর্থশাস্ত্রের **কী** করার আছে? ৭৪
তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা (কার্য) ক্রম **কী** হওয়া বাঞ্ছনীয়? ৭৪

প্রদর্শ

প্রদর্শ ১ নিকোলাস কোপার্নিকাস, গিওর্দানো ব্রুনো ১৪

২ টমাস বেকন, ফ্রাঁন্সুয়া কেনে, এডাম স্মিথ, লিওনার্দ সিসমন্ডি, কার্ল মার্কস ১৮

৩ জেনোফেনস, এ্যারিস্টটল, রবার্ট ম্যালথাস, জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল, আলফ্রেড মার্শাল, আর্থার সেসিল পিগু, জন মেইনার্ড কেইনস্, লায়নেল রবিন্স, পল স্যামুয়েলসন ২০

৪ কনফসিয়াস, চাণক্য, জন লক্, ডাড্লি নর্থ, ডেভিড হিউম ২৮

৫ অর্থনীতিশাস্ত্র আসলে রাজনৈতিক অর্থনীতি ৩২

৬ এন্ট্রোনিও সেররা, থমাস মান, জেরার্ড মালিনেস, এডোয়ার্ড মিথেলডেন, জ্যঁ বাতিস্ত কোলবার্ট ৩৬

৭ ফ্রাঁসোয়া কেনে্, জ্যাকস তুরগো ৩৭

৮ বানার্ড দ্য ম্যান্ডেভেইল ৩৯

৯ জেরেমি বেন্থাম, ম্যাক্স ওয়েবার, জন কেনেথ্ গলব্রেথ, কেনেথ্ বোলডিং, রবার্ট হেয়লব্রোনার ৪২

১০ টমাস মুর, টমাস কাম্পানেল্লা, রবার্ট ওয়েন, চার্লর্স ফোরিয়ার, লুই ব্লাঙ্ক ৪২

১১ লিও ওয়াল্রাস, উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স, কার্ল মেন্গার ৪৭

১২ ইবনে খালদুন ৬৮

ছক

ছক ১ অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশে বিভিন্ন মত-ধারার স্কুলের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকীয় মূল কথা ২৬

২ অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে যাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং যাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় না (বিষয়, নাম ও সময়কাল) ৬৬

অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ ৭৫

নির্ঘন্ট ৮৫

কৃতজ্ঞতা

গ্রন্থে "কৃতজ্ঞতা" স্বীকার বলে কিছু কথাবার্তা থাকার প্রচলনটি ভালো সংস্কৃতির পরিচায়ক। তবে "কৃতজ্ঞতা" অংশটি লেখা বেশ কঠিন। অনেক কারণেই। যার মধ্যে অন্যতম হলো সঠিকতা, সময়োপযোগিতা, মাত্রা জ্ঞান, অন্তর্ভুক্ত না হবার সম্ভাবনা (সচেতন অথবা অবচেতন যেকোনো কারণেই হতে পারে)। "কৃতজ্ঞতা" স্বীকারের 'সভ্য সংস্কৃতি; এবং "সম্ভাব্য অসম্পূর্ণতার বিপদ" এসব মেনে নিয়েই প্রথমেই যাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা হলেন আমার মা-বাবা-শিক্ষক। আমার মা প্রয়াত নুরুন নাহার এবং বাবা প্রয়াত (ডা.) এম এ কাসেম উভয়েই আমাকে ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ শিখিয়েছিলেন; শিখিয়েছিলেন "সবার উপর মানুষ সত্য" এ কথার মর্মার্থ। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ২০ বছর (১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকে ১৯৭০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত) – প্রাইমারি স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত – আমি আমার সব শিক্ষকের কাছেই কৃতজ্ঞ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ২০ বছরে শতাধিক শিক্ষকের ছাত্র হবার সুযোগ হয়েছিল, যাঁদের একজনও বলেননি –"সদা নিজের কথা ভাববে", "ন্যায়নীতির ধার ধারার দরকার নেই", "মূল্যবোধ এক মূল্যহীন বিষয়"। আমার এসব শিক্ষকের একজন ছিলেন ৭৪ বছর বয়সী অধ্যাপক লেভ মাতবিয়েভিচ মর্দুখোভিচ। এটা ১৯৭৬ সনের দিকের কথা। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থনীতির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র (তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো শহরে প্লেখানভ ইনস্টিটিউটে, যার এখনকার নাম প্লেখানভ সর্বরাশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনোমিকস)। অধ্যাপক মর্দুখোভিচ "অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শন ইতিহাস" (History of Economic Thought) পড়াতেন। তাঁর ক্লাস-বক্তৃতায় ৫০-৬০ জন ছাত্র হবার কথা কিন্তু হতো প্রায় ২০০-২৫০ জন, যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক। "অর্থনীতি চিন্তার দর্শন" যে সুগভীর ও গুরুত্ববহ এ নিয়ে আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্ভবত অধ্যাপক মর্দুখোভিচই প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি জানি, আমার এ কৃতজ্ঞতার কথা এখন থেকে চল্লিশ বছর আগের আমার ঐ শিক্ষকের সন্তান অথবা তাঁর সন্তানের সন্তানদের কেউই সম্ভবত জানতে পারবে না।

এ গ্রন্থের "বিষয়বস্তু" নিয়ে আমার সক্রিয় ভাবনার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু বলা চলে তখন থেকে, যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি – ১৯৮২ সালে (আজ থেকে ৩৪ বছর আগে; আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার ৮ বছর পরে)। প্রগতি-চিন্তার জন্য সময়টা ছিল প্রতিকূল। একদিকে দেশে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা জেঁকে বসেছে; আর অন্যদিকে প্রগতিমুখী সমাজচিন্তার গতি মন্থর (সময়টা ছিল বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের আকাল-সূচনাকাল) – সব মিলিয়ে ভবিষ্যৎটা বেশ অনিশ্চিত। সমসাময়িক ঐ সময়ে আমার কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে তখনও অনেক কিছুর পাশাপাশি পড়ানো হতো সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ইকোনমিক সিস্টেমস, অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস। পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে দেশের অর্থনীতি দুর্বৃত্তায়িত হলো, রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হলো আর সেই সাথে লক্ষ করলাম আমাদের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষাক্রমও (curriculum) পরিবর্তিত হতে থাকল। ১৯৮২-র দিকেও আমরা ভাবতাম অর্থনীতিশাস্ত্র যথেষ্ট বিচারবোধসম্পন্ন নীতিশাস্ত্র; আর আস্তে আস্তে পরিবেশটাই এমন হলো, যখন ভাবতে "বাধ্য হলাম" যে অর্থনীতিশাস্ত্রে "শ্রেণিস্বার্থ বিচারে নিরপেক্ষ" 'নীতি'র চেয়ে সংখ্যাবাচক দিকগুলো বেশি গুরুত্ববহ। আমরা প্রাচীন দার্শনিক প্লেটোর কথা ভুলেই গেলাম যে "একটি ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হলো জ্ঞান, সংখ্যা বা পরিমাণ নয়"। এ পথ-পরিক্রমায় আমাদের বিভাগের অনেক ছাত্র এবং আমার সহকর্মীদের অনেকেই অনেক সময় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন – অর্থনীতিশাস্ত্রের হচ্ছেটা কি? যাচ্ছিটা কোন দিকে? এসব প্রশ্নই বলা চলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার প্রাক্‌ভাবনাকে সেই পথে নেয়, যা আমাকে শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এ প্রক্রিয়ায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁরাও যাঁরা আমার ভাবনার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন অথবা একমত নন। কারণ তাঁদের মতও আমাকে ভাবিত করেছে, যদিও আমি জানি "আমরা আমাদের নিজ দৃষ্টির সীমানাকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা বলেই মনে করি" (কথাটি দার্শনিক আর্থার শোপেনহাউয়ার-এর)। আর এসব কারণেই আমি আমার সব প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মীর প্রতি নিঃশর্ত কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি আমি সঙ্গত কারণে তাদেরই উৎসর্গ করেছি।

এ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রাথমিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলনামূলক সুসংবদ্ধভাবে আমি সর্বপ্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনে 'সম্মেলন বক্তৃতা' হিসেবে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে এবং পরবর্তীকালে ৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ঊনিশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে 'প্লেনারি বক্তৃতা' হিসেবে উপস্থাপন করি। উভয় ক্ষেত্রেই প্রবন্ধ-শিরোনাম ছিল "অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ ও নব্য-উদারবাদী মতবাদ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে"। পরবর্তীকালে উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটির বিষয়বস্তুর একটু পরিবর্তন করে "নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ:

"দর্শনের দারিদ্র্য প্রসঙ্গে" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রে "নাজেন্দা-আজিজ ট্রাস্ট বক্তৃতা" প্রদান করি (২৮ মে ২০১৫)। ২০১৪-১৫ সালের এসব "সম্মেলন বক্তৃতা", "প্লেনারি বক্তৃতা" এবং "ট্রাস্ট বক্তৃতা"গুলোর বিষয়াদিই বলা চলে এ গ্রন্থের মূল ভিত্তি। এ প্রেক্ষাপটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ড. জামাল উদ্দিন আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ইউজিসি অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান-এর প্রতি।

এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন চিন্তা-চেতনায় অগ্রজ এবং প্রগতিশীল চেতনার একজন ভিন্নধর্মী অর্থনীতিবিদ যাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সমাজচিন্তক বলে মনে করি। তিনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি অধ্যাপক ড. হায়দার আলী খান, কলোরাডো স্টেটের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং জন ইভান্স ডিস্টিংগুইসড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিস্টিংগুইসড সিনিয়র ফেলো। মুখবন্ধটি লিখে তিনি এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, আমি তাঁর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি টাইপ ও পুনঃটাইপে সহযোগিতা করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের (এইচডিআরসি) মো. মোজাম্মেল হক, মো. আরিফ মিয়া, সাবেদ আলী; পাণ্ডুলিপি টাইপের পরে একাধিকবার পাঠ করে ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করেছেন সেলিম রেজা (এইচডিআরসি); পাণ্ডুলিপির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বানানরীতি ও ভাষা-শৌষ্ঠব একাগ্রতার সাথে দেখে দিয়েছেন আমার প্রিয়ভাজন আফজালুল বাসার; সর্বশেষ পাণ্ডুলিপির বাংলা বানানরীতি নিষ্ঠার সাথে দেখে দিয়েছেন এস এম তারিকুল হাসান; গ্রন্থের শেষে 'সহায়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থসমূহের' তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, আসমার ওসমান (এইচডিআরসি) এবং নাসিয়া জামান (প্রভাষক, জাপান স্টাডি সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) – আমি এদের সবার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রাক্-চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি একজন পাঠকের দৃষ্টিতে পাঠ করে দেবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান স্টাডি সেন্টারের প্রভাষক ড. দিলরুবা শারমিন ও মিস লোপামুদ্রা মালেককে আন্তরিক ধন্যবাদ।

গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণের কাজটি করেছেন সব্যসাচী হাজরা আর ছাপার কাজটি নিখুঁত করার চেষ্টা করেছেন শাহীন আহমেদ – এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রেসে যারা দিন-রাত শ্রম দিয়ে আমার এ গ্রন্থকে আপনাদের সামনে মেলে ধরেছেন – আব্দুল মোতালেব, নিত্য চন্দ্র, আরিফ, ইমরান ও গিয়াসউদ্দিন – সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার গ্রন্থ রচনার নিভৃতস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ফুলার রোড ৩৭/জ-এর চিলেকোঠায় আমাকে সময়-অসময়ে চা-পানি দিয়েছে শিল্পী খাতুন, আদুরি খাতুন, আবদুল হক বাবুল – ওদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর আমার ক্লান্তিহীন চিন্তাশ্রমে উৎসাহ যুগিয়েছে আমার কন্যাত্রয় অরণি, আনোখি, অবন্তি ও সহধর্মিণী অধ্যাপক ডা. শাহিদা আখতার – ওদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য।

সব শেষে আগাম ধন্যবাদ সেসব পাঠককে, যারা গ্রন্থটি পাঠ করবেন। আর আগাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের প্রতি, যারা পাঠ করে মতামত দেবেন।

ঢাকা: ২৮ মার্চ ২০১৭ আবুল বারকাত

অধ্যায় ১

ভূমিকা:
এ গ্রন্থে কী নিয়ে ভাবনা

"আমি অনেক গ্রন্থ সম্পর্কে জানি, যা পাঠকদের জন্য বিরক্তিকর;
কিন্তু আমি এমন কোনো গ্রন্থের কথা জানি না, যা তাদের সত্যি ক্ষতি করেছে।"
ভলতেয়ার, ১৬৯৪-১৭৭৮

"অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়ে এ পর্যন্ত কেউ তেমন কিছু বলেননি, লেখেননি" – এ কথাগুলো আমি ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজেন্দা-আজিজ ট্রাস্ট বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলাম।[১] বক্তব্যটিকে উপস্থিত কয়েকজন সহজভাবে নেননি, কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে নেন, কেউ কেউ মনে করেন এ বক্তব্য অর্থনীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে অযাচিত আক্রমণ; অনেকেই এ নিয়ে বেশ কিছু যৌক্তিক প্রশ্ন করেন। তখন থেকেই ভাবছিলাম, অর্থশাস্ত্রের বিকাশে সংশ্লিষ্ট চিন্তকদের চিন্তার অস্পষ্টতা, মোহাচ্ছন্নতা, ভাবনার 'দারিদ্র্য' (poverty of thoughts) এবং অতীতের ভাবনা-চিন্তাকে অস্বীকার করার প্রবণতা – এসব নিয়ে আমার ভাবনাগুলো সহজবোধ্যভাবে গ্রন্থাকারে লেখা আবশ্যক। এ আবশ্যকতা বোধের অনেক কারণের অন্যতম কারণ ছিল এ রকম যে অর্থনীতিশাস্ত্রকে আমি কখনও প্রকৃতিবিজ্ঞান (natural science) মনে করিনি (করতে পারিনি), মনে করেছি নীতিশাস্ত্র (moral science)। এ বিষয়ে পরে আসব।

গ্রন্থের শুরুতেই বলে রাখি আমি জানি যে আমি যা বলতে যাচ্ছি তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে হবার কোনো কারণ নেই। আমাকে বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে অন্তত এ কারণেও যে আমি যা বলব তা প্রথাসিদ্ধ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে যথেষ্ট মাত্রায় 'বেমিলসম্পন্ন' এবং বলা চলে 'সাংঘর্ষিক'। আমি চাই তর্ক-বিতর্ক হোক, তবে সময়ক্ষেপণকারী কূটতর্ক নয়; চাই সত্যানুসন্ধানী সমালোচনা হোক, তবে সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা নয়। আর এসব কারণেই মূল বক্তব্য-বিশ্লেষণ উপস্থাপনের আগে কিছু ধারণাগত বিষয় স্পষ্ট করে নেয়া সমীচীন মনে করি। বিষয়গুলো এ রকম:

প্রথমত; এ গ্রন্থে আমি 'অর্থনীতি', 'অর্থনীতিশাস্ত্র', 'অর্থশাস্ত্র', 'অর্থনীতিবিজ্ঞান', 'অর্থনীতিচিন্তা' – এসব প্রপঞ্চ বা ধারণা (category অর্থে) ব্যবহার করেছি। আমি এসব ধারণা ব্যবহার করেছি সম-অর্থে, একই বিষয় বুঝাতে। এসব ধারণার অর্থ একই – অর্থনীতিশাস্ত্র বা ইকোনমিকস্ (Economics) বুঝাতে এসব ব্যবহার করেছি। সুতরাং এসব 'ধারণা' বা 'প্রপঞ্চ' নিয়ে কোনো ধরনের দ্ব্যর্থবোধ-এর সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত; 'দর্শনের দারিদ্র্য' বলতে আমি 'দর্শনশাস্ত্রের দারিদ্র্য' বুঝাইনি। অর্থাৎ বিষয়টি 'poverty of philosophy', 'philosophy of poverty' নয়। আমার মতে দর্শনের কাজ হলো 'চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা', 'চিন্তাকে স্পষ্ট করা'। আর এ ধারণা মেনেই 'দর্শনের দারিদ্র্য' অনুসন্ধানে আমার ক্ষেত্র হলো অর্থনীতিশাস্ত্রে বিগত কয়েক শত বছর যেসব মৌলিক ভাবনা-চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেসব বিচার-বিশ্লেষণ করা। ক্ষেত্রমতে আমি এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগের সংশ্লিষ্ট জ্ঞানজগৎ পরিভ্রমণ করেছি (যেমন ফান লি, জেনোফেনস, চাণক্যের অর্থনীতিশাস্ত্র, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, প্রভৃতি)। অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য'-এর রূপ হতে পারে বহুমাত্রিক, অনেক ধরনের। তবে এ গ্রন্থে সম্ভাব্য বহুমাত্রিক এসব রূপের মধ্যে দুটি বিষয় চয়ন করেছি: (১) সারবস্তু বা মর্মার্থগত রূপ (অর্থাৎ essence অর্থে) অর্থাৎ অর্থনীতিশাস্ত্র যা নিয়ে যা বলে তার মর্মার্থগত দিক, এবং (২) কারও কারও মৌলিক অবদান

[১] বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল, ২০১৫, "নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ: 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে", নাজেন্দা-আজিজ ট্রাস্ট বক্তৃতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ২৮ মে ২০১৫। পৃ. ১৩-৪১।

স্বীকার না করা যাকে আমি "মনন-মানসিকতার দারিদ্র্য" (mindset poverty) বলে অভিহিত করেছি। প্রথম ধরনের দারিদ্র্যকে আমি বলব 'সাধারণ দারিদ্র্য' (general poverty) আর দ্বিতীয় ধরনের দারিদ্র্য হলো 'সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য' (specific poverty)।

তৃতীয়ত; এ গ্রন্থের শিরোনাম "অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য" শিরোনামটি "অর্থনীতিচিন্তায় দর্শনের দারিদ্র্য"-ও হতে পারত। 'Discipline' অর্থে 'শাস্ত্র' আর 'Thoughts' অর্থে 'চিন্তা' এক কথা নয়। এ কথা মেনে নিয়েই আমি দুটোকেই একই অর্থ বুঝাতে ব্যবহার করেছি।

চতুর্থত; এ গ্রন্থে আমি অর্থনীতিশাস্ত্রকে প্রকৃতিবিজ্ঞান নয় (not natural science) মূলত নীতিশাস্ত্র (moral science, ethical science, ethics) হিসেবে অভিহিত করেছি। যে কারণে সংশ্লিষ্ট দ্ব্যর্থবোধ পরিহারের লক্ষ্যে "নীতিশাস্ত্র" ও "অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্র" বিষয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। 'নীতিশাস্ত্র' আসলে দর্শনশাস্ত্রেরই একটি শাখা, যেখানে মানুষের ব্যবহারগত সম্পর্কের তাৎপর্যগত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ করা হয়। নীতিশাস্ত্রের দুটো দিকের একটি হলো "নীতিতত্ত্ব" (Theory of ethics), আর অন্যটি হলো "নীতিতত্ত্বের প্রয়োগ" বা "ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র" (Applied ethics)। "নীতিতত্ত্ব"-এর মূল বিষয় যা নিয়ে আবর্তিত তা হলো ভালো-মন্দ কাকে বলে; মানুষের কর্মের পেছনের চালিকাশক্তির নিহিতার্থ কী ইত্যাদি প্রশ্নের তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিক আলোচনা। আর "প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্র"-এর বিষয় হলো মানুষের কোন ব্যবহার ভালো আর কোনটা মন্দ, মানুষের সাথে মানুষের কী সম্পর্ক হওয়া সঙ্গত; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন নীতি কাম্য এবং কোন আদর্শ অনুসরণ সঙ্গত – এসব নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ। তবে আমি মনে করি, যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলা উচিত – যা অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতিশাস্ত্রীয় অবক্ষয় বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ – তা হলো ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গত-অসঙ্গত, উচিত-অনুচিতের বোধ মানুষের জীবনে গোড়া থেকেই ছিল (যেমন আদিম সমাজে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সুনীতিবোধ, সাম্যবোধ ও তার প্রয়োগ); কিন্তু যখন থেকে শ্রেণিসমাজের উদ্ভব হলো (অর্থাৎ দাস যুগ থেকে) তখন থেকেই নীতিশাস্ত্র কেবল ব্যক্তির মনোভাব-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই নয় রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের (যে রাষ্ট্র কিন্তু আদিম সমাজে ছিল না; যে রাষ্ট্রের কাজই হলো নীচুতলার মানুষদের পীড়িত করা) অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপান্তরিত হলো। আর সেটাই যদি সত্যি হয় সেক্ষেত্রে যে অর্থনীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র থেকে উৎপত্তি সে অর্থনীতিশাস্ত্রেরও নীতিশাস্ত্রীয় নিরিখে অবক্ষয় হবে, হবে অধোগতি, মানবকল্যাণ-এর ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ামক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের শাস্ত্রে রূপান্তর হবে – এটাও স্বাভাবিক। সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্রকে যখন আমি নীতিশাস্ত্রীয় বিদ্যা বলছি, তখন "নির্বিচার নীতিশাস্ত্র" বলছি না (নীতিশাস্ত্র 'সুনীতিশাস্ত্র' থেকে 'কুনীতিশাস্ত্র'-এ রূপান্তরিত হয়েছে); আর যখন অর্থনীতিশাস্ত্রের রূপান্তর প্রয়োজনীয়তার যে কথাটি এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলেছি তা থেকে কোনোভাবেই ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে আমি কোনো মানবকল্যাণ-বিবর্জিত (শ্রেণিভিত্তিক সমাজে) নীতিশাস্ত্রের কথা বলছি। অর্থাৎ আমার কথা হলো নীতিশাস্ত্রেরও (নীতিতত্ত্ব ও ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র) মানবকল্যাণকামী রূপান্তর হতে হবে এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় রূপান্তরে ঐ ধারাকেই দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমত; এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছে সাধারণ জ্ঞানপিপাসু পাঠকের জন্য; অর্থনীতিশাস্ত্রের ছাত্র, বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিতদের জন্য নয়। তবে আশা করি শেষোক্তরাও এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হবেন।

শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়টি জটিল। এ জটিলতা শুধু অর্থনীতিশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিষয়টি জটিল এ জন্য যে অর্থনীতিশাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট চিন্তা-দর্শন একদিকে যেহেতু সমসাময়িক ঐতিহাসিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং ঐ যুগের 'নিয়ামক ক্ষমতা কাঠামোর' (dominant power structure) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেহেতু ঐ চিন্তা-দর্শন বিশ্লেষণে সে যুগের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস নির্মোহভাবে জানতে হবে; আর অন্যদিকে অর্থনীতিশাস্ত্র যেহেতু উদ্ভব সূত্রেই নীতি-নৈতিকতা শাস্ত্রীয়, মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রীয় এবং বিচারবোধকেন্দ্রিক এবং যথেষ্ট মাত্রায় এলোমেলো, সেহেতু অর্থশাস্ত্রের চিন্তা-দর্শন বিচারে এসব বিষয়কেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে।

অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্যের' আরো একটা দিক আছে, যা কেউই তেমন বলেন না। বিষয়টি হলো এক ধরনের 'মননের দারিদ্র্য' (mindset poverty): 'অতীতের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অস্বীকারের দারিদ্র্য' (poverty of not recognizing the past knowledge)। যেমন অর্থনীতিশাস্ত্রে তেমন স্বীকারই করা হয় না যে এ শাস্ত্রের মৌলিক দর্শনের উদ্‌গাতা ছিলেন জেনোফেনস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল; বলা হয় যে ১৭৭৬ সালে "The Wealth of Nations"

গ্রন্থ প্রকাশের কারণেই এডাম স্মিথই অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক। কিন্তু এডাম স্মিথের এ গ্রন্থ প্রকাশের ৩৫০ বছর আগে একই বিষয়ে গভীরতম বিশ্লেষক আরব-দার্শনিক ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)-কে তেমন স্বীকৃতি দেয়া হয় না (এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বলব)।

উল্লেখ করে রাখি যে এ গ্রন্থে আমার মূল লক্ষ্য ব্যাপক-বিস্তৃত অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thought) রচনা নয়। তবে এসব বিচার-বিশ্লেষণ করেই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি নির্যাস কথা, যা আসলে আমার উপসংহারিক বক্তব্য। যেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রের বর্তমান যুগ হলো এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট নব্য-উদারবাদীদের (Neo-liberalism) যুগ, সেহেতু গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি ধারার মতবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির মহাসংকট ও মহামন্দার বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও একবিংশ শতকে অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের লক্ষণসমূহ উত্থাপন করেছি।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিচিন্তা দর্শনগতভাবে প্রকৃত অর্থে অতীতের সব অর্থনীতিচিন্তা থেকে পশ্চাৎপদ যার উদ্দেশ্য এমনকি নীতিশাস্ত্রীয় মানবকল্যাণ চিন্তার ধারেকাছেও নেই, যা আসলে দর্শন-চিন্তাও নয়, যা প্রধানত প্রায়োগিক-প্রেসক্রিপশন জাতীয় (Prescriptive instrumental economics)। অর্থনীতিশাস্ত্রের নব্য-উদারবাদী মতবাদটি সেসব পথ-পন্থা-পদ্ধতি বাতলে দেয়, যা মুক্তবাজারের নামে – যে মুক্তবাজার কখনও মুক্তও নয়, এবং নয় তা দরিদ্র-বান্ধব – শ্রেণিসমাজে বৈষম্য বাড়াতে বদ্ধপরিকর, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মূলত সাম্রাজ্যবাদের ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখার কৌশলাদি বাতলে দেয়। এ নব্য-উদারবাদী দর্শন মাত্রাতিরিক্ত আগ্রাসী এবং সন্দেহাতীত অনৈতিক।

উদারবাদের স্বর্ণযুগ (Golden age of Liberalism) অর্থাৎ ১৮৭০-১৯১৩ কালপর্ব যা ছিল ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের যুগ – তার তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৪৫ পরবর্তী) মার্কিন আধিপত্যবাদের যুগ অনেক বেশি নির্মম, নিষ্ঠুর, বর্বর, অসভ্য। আর মার্কিন আধিপত্যবাদের এ যুগের অর্থনীতিশাস্ত্রীয় কূট পরামর্শদাতাদের মতবাদই হলো নব্য-উদারবাদ। নব্য-উদারবাদ সে পরামর্শই দেয়, যা বাস্তবায়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের সব মৌল-কৌশলিক সম্পদে (primary strategic resources), যেমন (১) জমি সম্পদ, (২) জল সম্পদ, (৩) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, (৪) আকাশ-মহাকাশ সম্পদে তাদের শুধু অভিগম্যতা নয় (not just access) – নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ-আধিপত্য (absolute control and command) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

নব্য-উদারবাদী অর্থশাস্ত্রীয় মতবাদ সে পরামর্শই দেয় যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বে বৈষম্য-অসমতা বাড়লে বাড়ুক, বাড়ুক বিশ্বের প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের বঞ্চনা-বিচ্ছিন্নতা (alienation এবং deprivation অর্থে)। কিন্তু যে কোনো পথে যে কোনো পদ্ধতি ও পন্থায় উল্লিখিত চারটি বৈশ্বিক মৌল-কৌশলিক সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হোক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য। এ আধিপত্য বাস্তবায়নে নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শ একদিকে বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিধি বিনির্মাণ প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO)-কে নিজের মতো করে নিয়ে নিজের স্বার্থোদ্ধারে কাজে লাগাতে হবে। অন্যদিকে প্রয়োজনে বিশ্বের যে কোনো দেশে সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহারসহ যে কোনো পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, সেটা যত বেশি 'ক্রিমিনাল' মাত্রারই হোক না কেন[২]। এসবই নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনের মহাদারিদ্র্যের একই সাথে কারণ ও পরিণাম। একদিকে অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনগত 'মহাদারিদ্র্য' আর অন্যদিকে বৈশ্বিক মহাবিপর্যয়ের আলামত এ দুই কারণে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে নতুন তত্ত্ব-দর্শন বিনির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছি। এবং একই সাথে বলেছি অর্থনীতি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি-সংশ্লিষ্ট পঠন-পাঠন পুনঃগঠন নিয়ে কথাবার্তা।

---

[২] এসবের অসংখ্য উদাহরণের একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সত্য এ উদাহরণটি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা 'ইকনমিক হিট ম্যান' জন পার্কিনস। তিনি লিখেছেন "ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জেইমি রোলডস ও পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর টোরিজসকে আমি তাদের দেশপ্রেম ও সজ্ঞান-চেতনার জন্য খুবই সম্মান-শ্রদ্ধা করতাম। ঐ দুজনই কয়েক দিনের ব্যবধানে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাদের মৃত্যু আসলে দুর্ঘটনা ছিল না। আসলে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। কারণ তারা উভয়েই বিশ্ব সাম্রাজ্যের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, সরকার ও ব্যাংক-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন...। ভয়-ভীতি অথবা ঘুষ-দুর্নীতি সবসময়ই আমার পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল" (দেখুন, John Perkins. 2006. Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world. পৃ. ix)।

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদের 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' প্রসঙ্গটি উত্থাপনের আগে চতুর্থ অধ্যায়ে নব্য-উদারবাদের দর্শনগত মহাদারিদ্র্যের ভিত্তি বা ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী (stage setting matters) অর্থনীতিশাস্ত্রের বিগত সাড়ে ৫ শত বছরের অন্যান্য বিভিন্ন মূল ধারার সংক্ষিপ্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে 'দর্শনের দারিদ্র্য' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি। তার আগে – গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে – স্বল্প কথায়, সহজবোধ্যভাবে অর্থনীতিচিন্তার শাস্ত্রীয় মূলধারাগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা বলেছি। এ অধ্যায়ের শিরোনামই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়; শিরোনাম হলো "অর্থনীতিশাস্ত্রে কে-কী-কেন বলেন? সহজিয়া কথা"। প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্রে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রীয় জ্ঞান অস্বীকার করার বা এড়িয়ে যাবার যে অসুস্থ-অশোভন প্রবণতা (অথবা মানসিক বৈকল্য) – এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছি গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। বলে রাখি যে বিগত ২ হাজার বছরে অর্থনীতিশাস্ত্রে যেসব পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁদের পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে স্বল্প কথায় যতটুকু বলা সম্ভব ততটুকু বলেছি প্রদর্শাকারে (অর্থাৎ 'বক্স' এর মধ্যে; আশা করি পাঠক এসব পাঠ করবেন)। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়োজন বোধের কারণে গ্রন্থের শেষে "অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ" শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সন্নিবেশ করেছি।

অধ্যায় ২

কিছু নির্যাস কথা

"আমরা আমাদের নিজ দৃষ্টির সীমানাকেই
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা বলেই মনে করি।"
আর্থার শোপেনহাউয়ের, ১৭৮৮-১৮৬১

অর্থনীতিশাস্ত্রে মৌলিক আবিষ্কার অথবা মৌলিক চিন্তা খুব একটা নেই বললে অতিকথন হবে না। বেশির ভাগ অর্থনীতি চিন্তাদর্শন সময় ও স্থানভেদে সমসাময়িক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আবর্তিত। এসবে মৌলিকত্বের সর্বজনীনতা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না বলছি এ কারণে যে অর্থশাস্ত্রীয় ঐসব চিন্তার গুণ-মানসহ গুরুত্বের সর্বজনীনতা 'মহাবিজ্ঞানী' দার্শনিক কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) অথবা 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' দার্শনিক গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) "ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার" মত নির্মোহ ধ্রুব সত্য নয় (কোপার্নিকাস ও ব্রুনো সম্পর্কে প্রদর্শ ১-এ বলা হয়েছে)। এ নিরিখে কার্ল মার্কসের অর্থশাস্ত্রীয় চিন্তাও শাশ্বত নয়; কারণ তিনি পুঁজিবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) ঐতিহাসিক চতুর্থ বৃহৎ স্তর মাত্র; যে পুঁজিবাদ তাঁরই মতে শেষ স্তর নয় (এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। অবশ্য সাম্যবাদ অথবা নিদেনপক্ষে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে এমন এমন কথাও শোনা যায় যে "সাম্যবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হলো পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের দীর্ঘতম পথ।"

অর্থনীতিশাস্ত্রে চিন্তার মৌলিকত্ব দাবিদার হিসেবে যেসব ব্যক্তির দর্শন-ধারণা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রথাগতভাবে প্রায়শই তর্কাতীত যেসব নাম উল্লেখ করা হয় তাঁরা প্রধানত কয়েকটি বিষয়ে দার্শনিক এবং/অথবা প্রায়োগিক ভাবনার প্রাগ্রসর ভাবুক। আর সংশ্লিষ্ট দর্শন চিন্তায় যে প্রশ্নগুচ্ছ প্রাধান্য পেয়েছে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জরুরি। কারণ গত সাড়ে ৫ শত বছরের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে আমি এ শাস্ত্রের গুরুদের ভাবনা-চিন্তাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' হিসেবে অভিহিত করছি।

প্রদর্শ ১: নিকোলাস কোপার্নিকাস, গিওর্দানো ব্রুনো

নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩): পোলান্ডে জন্মগ্রহণকারী আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক। তার আগে ধর্ম থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা (খ্রিষ্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্ম, টলেমি, এ্যারিস্টটল) মনে করতেন যে পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র (Geocentric concept of universe)। কোপার্নিকাস এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করে বললেন, পৃথিবী নয় সূর্যই হলো কেন্দ্র (Heliocentric concept of universe)। তিনি সৌরজগতের বর্তমান সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। অর্থনীতিশাস্ত্রে কোপার্নিকাসের মৌলিক অবদান হলো ১৫১৭ সালে "অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব", যা এ বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত যুক্তি; আর ১৫১৯ সালে আধুনিক গ্রেসাম সূত্রের (যেখানে বলা হয় "খারাপ টাকা বাজার থেকে ভাল টাকাকে খেদিয়ে দেয়") প্রথম ভাষ্য।

গিওর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০): ইটালিয়। ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। বস্তুবাদী। তাঁর বস্তুবাদ প্যানথিজম বা সর্বপ্রাণবাদ। সৌরজগৎ নিয়ে তাঁর ধারণা কোপার্নিকাসের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসরমান। কোপার্নিকাস যেখানে সূর্যকে স্থির এবং সৌরমণ্ডলকে একমাত্র মণ্ডল মনে করতেন, সেখানে ব্রুনো মনে করতেন সূর্য স্থির নয় এবং সৌরমণ্ডল একমাত্র মণ্ডল নয়। তাঁর মতে, মহাজগতে অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব আছে এবং পৃথিবী ছাড়া অপর জগতেও জীবন থাকা সম্ভব। এসবই ছিল প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মবিরোধী ধারণা যে কারণে আট বছর কারাগারে রাখার পর ১৬০০ সালে তাঁকে রোম শহরে জনসমক্ষে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

উৎস: বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

আসা যাক অর্থনীতিশাস্ত্রের সেসব মৌলিক প্রশ্নগুচ্ছের কথায়, যা এ শাস্ত্রে প্রাধান্য পেয়েছে এবং যারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ঐ শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের 'নমস্য দার্শনিক' বলা হয়ে থাকে। এসব প্রশ্নকে দুটি প্রশ্নগুচ্ছে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ: সম্পদের উৎস কী? কে সম্পদ সৃষ্টি করে? কোথায়, কোন খাত-ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি হয়?

আসলে সম্পদের উৎস-সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ নির্ণয় করে কেউই কোপার্নিকাসের মতো 'মহাবিজ্ঞানী' অথবা গিওর্দানো ব্রুনোর মতো 'জ্ঞানশাস্ত্রের গৌরব' হতে পারেন না। কেন? সহজ উত্তর – মানব বিবর্তনের ইতিহাসের[৩] অধিকাংশ সময়কালের জন্য এ প্রশ্নটিই প্রযোজ্য নয়। এ প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ভাবনা-চিন্তা প্রযোজ্য শুধু তখন থেকে, যখন সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন আসল অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিবর্তনে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৃহৎ বর্গের স্তর থেকে – দাস যুগ থেকে। কিন্তু মানব ইতিহাসের কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ সময়কালই তো আদিম সাম্যবাদী সমাজ। আর মানব ইতিহাসের ৯৯ শতাংশ সময়কালের আদিম সমাজে সম্পদের উৎস-সংশ্লিষ্ট এ প্রশ্নটিই অবান্তর। **এ ধরনের** অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে আর যে-ই ভাবুক দার্শনিকদের ভাবার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের এ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অর্থাৎ আদিম যুগের উৎপাদিকা শক্তির বিবর্তন জানতে হয়েছে। যে বিবর্তনের ফলে যত সময় পরেই হোক এসেছে দাস যুগ। সঙ্গত কারণেই প্রথম শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা দাস যুগ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক পুঁজিবাদ পর্যন্ত সময়কালে নির্দিষ্ট গোষ্ঠির সংখ্যা-স্বল্প কয়েকজনের স্বার্থ সংরক্ষণে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের ভাবতে হয়েছে। আর ভাবতে ভাবতে দাস যুগ থেকে মধ্যযুগের দাসমালিক-ভূস্বামী-জমিদার-সম্রাট-রাজা-বাদশাহদের উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা হিসেবে অর্থনীতিশাস্ত্রের ভাবুকদের একপর্যায়ে এমনও বলতে হয়েছে যে "যুদ্ধ ভাল, যদি যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা থাকে" (যেমন মার্কেন্টাইলিস্ট বা বাণিজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ-পণ্ডিতদের)। আর একই কথা কিন্তু আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরতলার গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান (১৯১২-২০০৬)কে বহু 'চিন্তা-ভাবনা' করে বলতে হয়েছে "ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইরাক দখল করা মার্কিন অর্থনীতির জন্য ভাল হবে"। অবশ্য এ কথাও সত্য যে সম্পদের উৎস-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিকিৎসক-অর্থনীতিবিদ ফিজিওক্রাট ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (প্রদর্শ ২ দেখুন) হিসেবপত্তর কষে 'ট্যাবলু ইকনমিকে' (যা ছিল অর্থশাস্ত্রের প্রথম ম্যাক্রোইকনমিক মডেল)-তে রাজ-রাজড়াসহ সামন্তপ্রভুদের উদ্দেশে বললেন, "ফরাসি কৃষকদের ২০০ বছরের স্থবিরতার জন্য তোমরাই দায়ী"; "কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তপ্রভু যতদিন থাকবে, ততদিন কৃষককুলের জীবনে উন্নতির কোনোই সম্ভাবনা নেই, অতএব উন্নতি চাইলে সামন্তপ্রভুদের উপর উচ্চহারে কর বসানোর বিকল্প নেই"।

উপরে যা বললাম তা স্মরণ করানোর পেছনে আমার দুটো প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হলো – এ কথা প্রমাণের চেষ্টা করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বজনীন নয়, তা সমাজ বিকাশে উত্তরণ পর্বের ইস্যু, এবং পর্বটি ইতিহাসের সময়কাল-ব্যাপ্তি বিচারে স্বল্পকালীন। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো – এ কথা প্রমাণ করা যে সম্পদ-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুচ্ছের ভাবনা-চিন্তাকারী 'পণ্ডিত' অর্থনীতিবিদদের মূল লক্ষ্য ছিল দাসমালিক-ভূস্বামী-সম্রাট-রাজা-বাদশা-সামন্তপ্রভু-পুঁজিপতি-

---

[৩] ভূতত্ত্বীয় গবেষণায় পৃথিবীর বিবর্তনকে সময়ানুক্রমে চার ভাগে ভাগ করা হয়: (১) প্রিক্যামব্রিয়ান, (২) প্যালিওজয়িক, (৩) মেসোজয়িক, (৪) সিনোজয়িক। এসবের সাথে যুক্ত মানব বিবর্তন। পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪৫০ কোটি বছর বা তারও আগে; প্রথম প্রাণ বা প্রথম জীব কোষ সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ২৫০-৩৮০ কোটি বছর আগে; প্রথম বিশালদেহী ডাইনোসর জাতীয় প্রাণিদের সৃষ্টি আজ থেকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ৬ কোটি বছর আগে; দুই পায়ে দাঁড়ানো কিন্তু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকা লেজবিহীন চেহারার বানরকুলসদৃশ মানুষ এসেছে এখন থেকে ১৮ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে (বিবর্তনশাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা যাদের বলেন 'হোমো এরিকটাস'), আর বিবর্তনের এ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সোজা হয়ে হাঁটা এবং চেহারাতেও বানর সদৃশ্যতা তেমন নেই অর্থাৎ 'মানুষ' যাদের বিবর্তন শাস্ত্রের বিজ্ঞানীরা বলেন 'হোমো স্যাপিয়েন্স'— এই মানুষের আগমন এখন থেকে ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ বছর আগে। 'হোমো স্যাপিয়েন্স' এই মানুষই পরবর্তীকালে হোলোসিন যুগে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, Russell Ash. 2006. Whitaker's World of Facts. পৃ. ৩৪-৩৫; Knowledge Encyclopedia-The Big Book of Knowledge, 2012. পৃ. ১৮০-১৮১; John H. Postlethwait, Janet J.Hopson. 1992. The Nature of Life. পৃ. ৪১৮-৪২৬).

সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা।[৪] অতএব, বিষয়টি সার্বজনীনও নয়, মানবকল্যাণ উদ্দিষ্টও নয়। তাহলে সম্পদের উৎসসহ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির অনুসন্ধান উদ্দিষ্ট অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের চিন্তা-ভাবনা আসলেই তাঁদের 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রতিফলিত করে – এ বিষয়ে আমার তেমন কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ: বাজার ব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, 'মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য' নাকি বাজারে সম্রাট-রাজা-বাদশাহ-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ থাকতে হবে?

এখানেও প্রথম প্রশ্নগুচ্ছের অনুরূপ সমজাতীয় যুক্তি-কাঠামো প্রযোজ্য। আর তা হলো: উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ (production-exchange-distribution-consumption) – এই সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ রূপ ইতিহাসের কাল বিচারে বেশি দিন আগের কথা নয়। এ সমীকরণে মানুষের ভোগ-পরিভোগের (consumption) ব্যাপারটা মানব সভ্যতার ঊষালগ্নের প্রশ্ন। কারণ প্রাণিজগৎ বা জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় (human evolution) মানুষ যখন থেকে মানুষ হলো, তখন থেকেই তাকে খাদ্য ভোগ-পরিভোগের ভাবনা ভাবতে হয়েছে। আর সেটাও তো আদিম সাম্যবাদী যুগের কথা – এখন থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগের কথা।

মানুষের হোমো এরিকটাস থেকে হোমো স্যাপিয়েন্সে রূপান্তরে এবং দীর্ঘকাল হোমো স্যাপিয়েন্স অবস্থায় বিবর্তিত হবার ইতিহাসে প্রথমে মানুষ চার পা থেকে উঠে দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খাদ্য-সম্পদ – বন-জঙ্গলের মাটিতে পড়ে থাকা ফলমূল, জলাভূমির পাড়ে পড়ে থাকা মাছ-কাকড়াজাতীয় প্রাণি, মৃত পশুপাখি ইত্যাদি – সংগ্রহ করে জীবন পরিচালন করেছে। এভাবে সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক (collectionist activities) মানবজীবন চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর। প্রকৃতি ছিল বিরূপ। শৈত্যপ্রবাহ থেকে শুরু করে ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস আর জীবজন্তুর সাথে লড়াই-সংগ্রামে মানুষ যাযাবর জীবনে বাধ্য হয়েছে।

বিকাশের ক্রমধারায় এভাবেই কোনো একপর্যায়ে প্রকৃতি থেকে সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড মানব চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট হয়নি। এ প্রক্রিয়ায় পরবর্তীকালে অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবন পরিচালনে প্রকৃতির সাথে লড়াই-সংগ্রাম করে বহু লক্ষ বছর চিন্তা-ভাবনার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর প্রথম শ্রম-হাতিয়ার (instrument of labor)। যেটা সম্ভবত ছিল লাঠিজাতীয় এবং/অথবা ইট-পাথরজাতীয় কোনো হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে গাছে না উঠে আবিষ্কৃত ঐ শ্রম-হাতিয়ার ছুঁড়ে ফল পেড়ে মানুষ ক্ষুধা নিবারণ ও বংশ রক্ষা করেছে। এই শ্রম হাতিয়ারটাই বলা চলে মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভ কাল, যে আবিষ্কার মানুষকে জীবজগতের অন্যান্য সব প্রাণিকুল থেকে আলাদা সত্তায়, উচ্চতর আলাদা সত্তায় রূপান্তর ঘটিয়েছে। এটাই হলো মানুষের সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড (collectionist activities) থেকে শিকারভিত্তিক অর্থনীতিতে (hunting economy) রূপান্তর ভিত্তি। সেই সাথে এরই ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন-চাহিদা বেড়েছে আর অন্যদিকে পেছনের লক্ষ লক্ষ বছরের তুলনায় মানুষের বংশবৃদ্ধি (অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি) একটু একটু করে অতি ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে।[৫]

প্রথম শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কারের কয়েক লক্ষ বছর পরে মানুষ আরো শ্রম হাতিয়ার আবিষ্কার করল, যার মধ্যে অন্যতম জীবজন্তু, পশুপাখি শিকারের শ্রম হাতিয়ার – সুঁচাল পাথর, বর্শা-বল্লমসহ তীর-ধনুকজাতীয় শ্রম হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে মানুষ পশুপাখি শিকারসহ জীবজন্তু-পশুপাখিকে বশ মানাতে শিখল। আর সেই সাথে প্রকৃতির সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ও শিকারভিত্তিক অর্থনীতির মিশ্ররূপ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের শিকারভিত্তিক ও পশুপালনভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটল। এর ফলে স্থায়ী

---

[৪] সামাজিক বিজ্ঞানীদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা অথবা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার বিষয়ে তেমন সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না (এ সম্পর্কে পরে বলছি)। এখানে শুধু উল্লেখ করে রাখি যে, এমনকি 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' (pure science অর্থে)-ও এসব থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা (historian of science) থিওডর পোর্টার যুক্তি দেখিয়েছেন যে "এমনকি অনেক বৈজ্ঞানিক সংখ্যাতত্ত্বও রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপে প্রস্তুত করা হয়", (দেখুন, Porter Theodore. 1995. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life.)

[৫] আদিম যুগের জনসংখ্যা নিয়ে এ পর্যন্ত কেউই এমনকি আনুমানিক তেমন হিসেব দিতে পারেন নি। তবে জোয়েল কোহেন বলছেন এখন থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার; আর এখন থেকে ৩ লক্ষ বছর আগে তা ছিল ১০ লক্ষ, এখন থেকে ২৭ হাজার বছর আগে তা ছিল ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার (Joel. E. Cohen. 1996. How Many People Can the Earth Support. পৃ. ৭৯-৮১, ৪০০)। আর এখন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটি।

রূপ নিল উৎপাদন-ভোগ/পরিভোগ সমীকরণ, যে সমীকরণ মানুষের জীবনমান বাড়াল, যে সমীকরণে আর যাই থাক "বাজার" ('market' অর্থে) অনুপস্থিত।

মানুষের মানুষ হবার এ প্রক্রিয়ায় মানুষ পরস্পর পরস্পরের সাথে ভাব আদান-প্রদানের যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে আবিষ্কার করল ভাষা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে সম্ভবত ছিল বিভিন্ন বিষয় বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের হাক-ডাক-ইশারা ভাষা (যার ব্যাকরণসহ মর্মার্থ ভাষাবিজ্ঞানীদের এখনও অজানা)। আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ ভাষা মানুষকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে দিল।

উপরে যা বললাম এসবের অনেক কাল পরে মানুষ যা আবিষ্কার করল সেটা মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সম্ভবত সবচে বড় উল্লম্ফনের শক্ত ভিত্তি গড়ে দিল – সেটা হলো পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো, আগুন সংরক্ষণ এবং আগুনের বহুমুখী ব্যবহার। আগুন আবিষ্কার মানুষকে একদিকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিলো আর অন্যদিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে খাদ্য-খাবার খাওয়ার শর্ত সৃষ্টির ফলে মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল এবং যাযাবর জীবনের অবসানসহ একই স্থানে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি হলো। সভ্যতার ইতিহাসে এইই প্রথম মানুষ 'নিজেই নিজের ঠিকানা' সৃষ্টি করল যাকে বলে "Man makes himself"। আর এই ঠিকানা তুলনামুলক স্থায়ী হবার পরেই (তুলনামুলক স্থায়ী এজন্য যে সম্ভবত মানুষ তখন পর্যন্ত ঘর-বাড়ি বানাতে শেখেনি, পাহাড়ের গুহাতেই বাস করত) মানুষ সম্ভবত উৎপাদন-পরিভোগ (production-consumption) সমীকরণ কাঠামোকে অতীতের তুলনায় শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে সক্ষম হলো। এমন শক্ত ভিত্তি, যেখানে মানুষ কৃষিকাজের আগমন বার্তা পেয়ে গেল।

এতক্ষণ যা বললাম এটাই সেই নির্মোহ সত্য শাশ্বত বিবর্তনের লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস যে প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেই নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলল। এ প্রক্রিয়ায় অতীতের প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করে ভোগ-পরিভোগের আমূল রূপান্তর ঘটে; তা প্রতিস্থাপিত হলো মানুষের আবিষ্কৃত শ্রম হাতিয়ার, যোগাযোগের ভাষা আর আগুনের আবিষ্কার মধ্যস্থতাকারী উৎপাদন ও উৎপাদন ফলের সমতাভিত্তিক বণ্টন – এখানে বিনিময় (exchange) বলে কিছু নেই।

যেহেতু এখন পর্যন্ত "বিনিময়" বলে কিছু নেই, সেহেতু এখানে 'বাজারের' (market) প্রসঙ্গও নেই; 'বাজার' প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। আসলে বিনিময়ের প্রসঙ্গ আরো কয়েক লক্ষ বছর পরের প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গ এসেছে মানুষ যখন থেকে স্থায়ী কৃষিকাজসহ শ্রম বিভাজন (division of labour) এবং শ্রমের বিশেষায়ন (specialization) করেছে, তখন থেকে (অর্থশাস্ত্রে বিগত আড়াই হাজার বছর এসব বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। সেটাও হাজার হাজার বছরের প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং পরবর্তীকালে নিয়মবদ্ধভাবে। আনুষ্ঠানিক বিনিময়ের প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে, যখন মানুষ স্থায়ীভাবে এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে এবং যখন থেকে জীবন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। আদিম যুগে মানুষের যুথবদ্ধ জীবনকালের (collecive life) তুলনায় এসব সেদিনের কথা; মানব সভ্যতার ইতিহাস-কাল অনুযায়ী বেশি দিন আগের কথা নয়। আর 'বাজারের' প্রসঙ্গ এসেছে তখন থেকে, যখন থেকে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচার প্রশ্ন এসেছে; অর্থাৎ যখন থেকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার প্রশ্ন এসেছে। আর তা এসেছে তখন, যখন মানুষে মানুষে শোষণের প্রয়োজন হয়েছে।

সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'বাজার' প্রসঙ্গের শুরু মানব সভ্যতার প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার যুগে নয় অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী যুগে নয়, দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ দাস যুগে। আবার 'বাজারের' এ প্রশ্নটিও চিরস্থায়ী নয়। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার শেষ স্তর যৌক্তিকভাবেই মানুষে মানুষে শোষণভিত্তিক হবার কোনো কারণ নেই; সেটা প্রাকৃতিক বিধি অনুযায়ী উৎপাদিকা শক্তির (productive forces, আধুনিক যুগে এটাকেই অনেকে টেকনোলজি বা প্রযুক্তি বলেন) বিকাশের অনিবার্যতার কারণেই অবশ্যম্ভাবিভাবেই সেটা সারগতভাবে সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা (এ ব্যাপারে অন্য কোনো নামকরণও হতে পারে) হবে। এ রূপান্তর শুধু সময়ের ব্যাপার – হতে পারে তা এখন থেকে ৫০ বছর পরে অথবা ১০০ বছর পরে অথবা ১৫০ বছর পরে অথবা আরো পরে। এ

অবস্থায় মানবসমাজ কত দিনে পৌঁছুবে তা আদৌ মুখ্য বিষয় নয়; মুখ্য বিষয়, যুক্তির বিষয় যে সেটা হবে।

প্রদর্শ ২: টমাস বেকন, ফ্রাঁসোয়া কেনে্, এডাম স্মিথ, লিওনার্দ সিসমন্ডি, কার্ল মার্কস

টমাস বেকন (১৫১১-১৫৬৭): ব্রিটিশ ধর্মযাজক। সংস্কারকাদী প্রোটেস্টান্ট। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমসাময়িক যুগের ক্রমবর্ধমান জড়বাদের সমালোচক।

ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪): পেশায় চিকিৎসক। ফরাসি রাজা ১৫তম লুদভিগ-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেহে রক্ত সঞ্চালনকে প্রধান বিষয় হিসেবে মনে করতেন এবং চিকিৎসায় প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করতেন। ফরাসি কৃষকদের শতবর্ষের স্থবিরতার কারণ নিরূপণে অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে "ইকনমিক টেবল" আবিষ্কার করেন। অর্থশাস্ত্রে ফিজিওক্রাট ধারার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক।

এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০): স্কটল্যান্ডের দার্শনিক-নীতিশাস্ত্রিক। আধুনিক রাজনৈতিক-অর্থনীতিশাস্ত্রের (পরবর্তীকালে 'অর্থশাস্ত্র') জনক বলে স্বীকৃত। ১৭৭৬ সালে তাঁর রচিত "জাতিসমূহের সম্পদ" (Wealth of Nations) গ্রন্থের মাধ্যমে বলা চলে অর্থনীতিশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক অভিষেক। স্ব-স্বার্থ, শ্রম বিভাজন, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব, বাজারের অদৃশ্য হাত – এসবই অর্থশাস্ত্রে স্মিথের মূল কথা। স্মিথের সময়কালটা ছিল ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ – আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ, ইউরোপজুড়ে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বাভাস, সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ, আর ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের কাল।

লিওনার্দ সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২): পুরো নাম জ্যাঁ চার্লস লিওনার্দ সিসমন্ড দ্য সিসমন্ডি। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের স্বীকৃতিহীন অর্থনীতিবিদ। যিনি বলেছিলেন সম্পদ বৃদ্ধির চেয়ে সম্পদের সুষম বণ্টন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩): দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিশ্ববীক্ষা/বিশ্বদর্শন সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" (ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর সাথে যৌথ রচিত), "অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে" এবং "ক্যাপিট্যাল" তাঁর অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

"সম্পদ কে সৃষ্টি করে" (কোন খাতে তা সৃষ্টি হয়) এবং "বাজারব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত" – এই দুই প্রশ্নগুচ্ছ নিয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের "স্বীকৃত পণ্ডিতেরা" অনেক ভেবেছেন। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বা উপস্থিত বুদ্ধি (যাকে বলে কমন সেন্স, যা আসলে আন্-কমন) মতে যে বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবনার প্রয়োজন ছিল তা হলো "সৃষ্ট সম্পদ কীভাবে কাদের মধ্যে বণ্টন হয়" অর্থাৎ "উৎপাদিত সম্পদে কার-কোন শ্রেণির মানুষের হিস্যা কতটুকু হবে তা কীভাবে নির্ধারিত হবে।" এ নিয়ে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের গুরুরা তেমন ভাবেননি। প্রসঙ্গটি সর্বপ্রথম উত্থাপন করেন ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম "অস্বীকৃত পথপ্রদর্শক" সুইজারল্যান্ডের ইতিহাসবিদ-অর্থনীতিবিদ লিওনার্দ সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২; প্রদর্শ ২ দেখুন)। ১৮১৯ সালে প্রকাশিত "New Principles of Political Economy" গ্রন্থে সিসমন্ডি বললেন, "কোন্ পথ-পদ্ধতিতে সম্পদ বাড়ানো যায় এ নিয়ে অর্থনীতিবিজ্ঞান অতিরিক্ত কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু মানুষের সুখশান্তি বাড়াতে ঐ সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে বলেছে খুবই কম।" এ উপসংহারে পৌঁছুনোর আগে সিসমন্ডি ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের সামাজিক প্রভাব-অভিঘাত বিশ্লেষণ করে পুঁজিবাদের সম্ভাব্য বিপদ উদ্‌ঘাটন করে সমাজতন্ত্রের কথা বললেন।

অর্থনীতির শাস্ত্রীয় দর্শনের বয়স বেশি নয়। বড়জোর সাড়ে ৫শ বছর – ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ধর্মযাজক টমাস বেকন দিয়ে শুরু (প্রদর্শ ২ দেখুন)। যেখানে মানুষের মানুষ হবার বিবর্তন প্রক্রিয়ার শুরু কয়েক লক্ষ বছর। আবার দর্শনশাস্ত্র – শাস্ত্র হিসেবে অর্থনীতিশাস্ত্রের চেয়ে কয়েক হাজার বছর বয়োজ্যেষ্ঠ। কারণ দর্শনশাস্ত্রের কাজ (scope অর্থে) সময়ের নিগড়ে বাঁধা নয় – তা মৌলিক, বিস্তীর্ণ এবং বহুবিস্তৃত, যেখানে অর্থশাস্ত্রের কাজ সময়ের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এবং তা মৌলিকও নয় এবং যথেষ্ট সংকীর্ণ, ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান। সময়ের নিরিখে জগৎ, জীবন, মানবসমাজের বিবর্তন, মানুষের

চেতনা ও জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার কার্যকারণ নিরূপণে দর্শনশাস্ত্রের ক্যানভাসটা যেখানে বিশাল ও সামূহিক, সেখানে সময়ের নিরিখে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিশাস্ত্র বিজ্ঞানের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে (যেমন ফিজিওক্রাট ফ্রাঁসোয়া কেনে্, ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রিক এডাম স্মিথ) তা বড়জোর ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান বা অনুবিজ্ঞান হবার চেষ্টা করেছে আর একটি ক্ষেত্রে – কার্ল মার্কসের (প্রদর্শ ২ দেখুন) হাতে ক্রমে তা বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে বলা চলে।

এসব কথা বলছি এ কারণে যে, যেখানে দর্শনশাস্ত্রের কাজ হলো জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, সেখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের কাজ (যখন থেকে অর্থনীতিশাস্ত্র তুলনামূলক নিম্নমাত্রার বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে) সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার-সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রসমূহ (general laws) গড়ে তোলা। এসব কারণেই দর্শনশাস্ত্রে খোঁজ মেলে 'মহাবিজ্ঞানী' কোপার্নিকাস ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের গৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর, আর অর্থনীতিশাস্ত্রে বড়জোর একজন 'স্বীকৃতিপ্রাপ্ত' এডাম স্মিথ এবং কার্ল মার্কসের অথবা 'অস্বীকৃত' ইবনে খালদুন এবং লিওনার্দ সিসমন্ডির। অতএব, অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের আজ যে বিদ্যাভিমান ও জাত্যাভিমান তা ঐতিহাসিক সময় বিবেচনায় সর্বৈব মেকি বৈ কিছু নয়।

অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের বিদ্যাভিমান প্রকৃতি এমনই যে তাঁরা (অধিকাংশই) একদিকে যেমন সামাজিক সমগ্রক বা সামূহিক বিষয়ের খণ্ডচিত্র উপস্থাপন করে আসল সত্য আড়াল করেন আর অন্যদিকে তাঁরা সহজ বিষয় জটিল করতে পারদর্শী অথবা জটিল বিষয় সহজ করতে সক্ষম নন অথবা জটিল বিষয় জটিলতর করে উপস্থাপনে তাঁদের জুড়ি নেই।

অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা কথায় কথায় চাহিদা-সরবরাহের রেখচিত্র অঙ্কন করেন। যা পাঠ্যপুস্তক মতে আমাদের শিখিয়েছেন আলফ্রেড মার্শাল (তাঁর সম্পর্কে প্রদর্শ ৩-এ বলা হয়েছে)। অবশ্য ইতিহাস বলে আলফ্রেড মার্শালেরও ৫০ বছর আগে ১৮৩৮ সালে এন্থোনি কোরনোট-ই সর্বপ্রথম চাহিদা ও সরবরাহের রেখচিত্র এঁকেছিলেন। সে যাই হোক চাহিদা-সরবরাহের রেখচিত্রে দ্রব্যের মূল্য ও বিভিন্ন অনুমানভিত্তিক মানুষের আচরণের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা বলা হয়; বলা হয় যে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই বাজারে অংশগ্রহণকারীরা চাহিদা ও সরবরাহের রেখা দুটি যেখানে মিলিত হয় তার আশেপাশে ঘুরতে থাকবে – ঘুরতে থাকবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এ হলো পদার্থবিদ্যায় নিউটনীয় ভারসাম্য (Newtonian equilibrium) অনুসরণ পদ্ধতি। যে পদ্ধতি অনুযায়ী বস্তু স্থির (static), গতিময় (dynamic) নয়। অথচ সামাজিক বিষয়াদি (অর্থনীতি যার অঙ্গ) স্থির নয় গতিময় (গুরুত্বের কারণে এ বিষয় পরে আরো বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। অর্থনীতির শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা শুধু চাহিদা-সরবরাহের রেখচিত্র নির্মাণে এমনই পারদর্শী যে প্রশ্ন করলে ঐ রেখচিত্রে হয় চাহিদা রেখা না হয় সরবরাহ রেখা না হয় উভয় রেখাই ডানে-বামে উপরে-নিচে নিয়ে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেন। আর বেশি প্রশ্ন করলে সাধারণ্যে দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করে দুর্বোধ্য গাণিতিক মডেল বিনির্মাণ করে এমনসব কথাবার্তা বলেন যার মর্মবস্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরাও বোঝেন কিনা সন্দেহ। এ কথা বলা আবশ্যক যে, গণিত ব্যবহারে অর্থনীতিশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক রূপ বাড়ার কারণ নেই। অর্থনীতিশাস্ত্রে গণিত ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা আলফ্রেড মার্শাল তারই ছাত্র প্রখ্যাত অর্থনীতিশাস্ত্রীক আর্থার সেসিল পিগুকে ১৮৯০ সালের দিকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "(১) অর্থনীতিশাস্ত্রে গণিত ব্যবহার করবে শর্টহ্যান্ড ভাষা হিসেবে, অনুসন্ধানের ইঞ্জিন হিসেবে নয়, (২) ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ গণিত তোমার কাছে রাখবে, যতক্ষণ ওটা নিয়ে তোমার কাজ শেষ না হচ্ছে, (৩) তারপর বিষয়বস্তু ইংরেজিতে তরজমা করবে, (৪) তারপর উদাহরণ দিয়ে দেখাবে যে এসব বাস্তব জীবনের জন্য গুরুত্ববহ, (৫) এরপর ঐ গণিতকে পুড়িয়ে দাও, (৬) যদি ৪ নং-এ সফল না হও তাহলে ৩ নং-কে পুড়িয়ে দাও। আমি নিজে প্রায়ই এটা করি।"[৬] জিনিস দুর্বোধ্য করে অর্থনীতিবিদেরা বাহাদুরি নিতে চায়, চায় 'জ্ঞান' ফলাতে আর আমজনতা না বুঝে তাদের কুর্নিশ করেন। আর সম্ভবত এসব কারণেই মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ্ গলব্রেথ (১৯০৮-২০০৬) বলেছেন, "অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সম্মান পাবার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা ও মহাবিজ্ঞানী ভাব নিয়ে আশা ও বিশ্বাস

[৬] দেখুন, Todd. G. Buchholz. 2007. New Ideas from Dead Economists: An Introduction to Modern Economic Thought. পৃ. ১২১।

করে।" উল্লিখিত কারণেই বলতে হয় যে শেষ বিচারে নির্মোহ দর্শনশাস্ত্রের বিপরীতে অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য অনেক মাত্রায় স্বাভাবিক এবং অনেক মাত্রায় অর্থনীতিবিদদেরই সৃষ্ট।

প্রদর্শ ৩: জেনোফেনস, এ্যারিস্টটল, রবার্ট ম্যালথাস, জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল, আলফ্রেড মার্শাল, আর্থার সেসিল পিগু, জন মেইনার্ড কেইনস্, লায়নেল রবিন্স, পল স্যামুয়েলসন

জেনোফোন (বা জেনোফেনস) (খ্রি.পূ. ৪৩০-৩৫৪): প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। খ্রি.পূ. ৩৬০-এর দিকে লেখা ওয়কোনোমিকাস (Oeconomicus) গ্রন্থে গৃহস্থালী ও কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম 'অর্থনীতি' শব্দটি ব্যবহার করেন।

এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২): প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। দার্শনিক প্লেটোর (খ্রি.পূ. ৪২৮/৪২৭-৩৪৭) ছাত্র কিন্তু তাঁর সমালোচক; জ্ঞানসমুদ্র; যুক্তিশাস্ত্রের জনক; দাস-প্রধান গ্রিক সমাজের সমর্থক; বিশ্বাস করতেন দাস ও দাস-মালিক শ্রেণিভেদ জন্মগত, প্রাকৃতিক; স্বৈরতন্ত্র সমর্থন করেননি। সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জিভবনে গৃহস্থালী/গার্হস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন; তাঁর শিক্ষক প্লেটোর "সম্পত্তির সার্বজনীন মালিকানা শ্রেয়" একথা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন 'মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির' কারণে ব্যক্তিগত মালিকানা শ্রেয়; মহাজনী লগ্নি ব্যবসার বিরোধী এবং একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক মনে করেননি। ৬-১৩ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম দার্শনিকদের মাধ্যমে ইউরোপ এ্যারিস্টটল সম্পর্কে জেনেছিল।

রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪): রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জনমিতিশাস্ত্রে অবদানের জন্য খ্যাত। ম্যালথাসের মূল কথা এ রকম: মানুষের সুখ-আকাঙ্ক্ষা অসীম; কিন্তু যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি, সেহেতু দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, অসুস্থতা – এসব থেকে পরিত্রাণ কঠিন; দারিদ্র্য থেকে মুক্তির তেমন কোনো পথ নেই; শ্রম মজুরি রাখা উচিত সর্বনিম্ন মাত্রায়, যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়; মূল্য নির্ধারণ হওয়া উচিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর চাহিদার ভিত্তিতে।

জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই (১৭৬৭-১৮৩২): ফরাসি অর্থনীতিবিদ। তাঁর মূল কথা হলো অর্থনীতিতে কখনও চাহিদার সংকোচন (contraction of demand) অথবা অতি উৎপাদন (over production) হতে পারে না। কারণ যা কিছু উৎপাদিত হয় তার বাজার আছে দেখেই উৎপাদন হয়। সুতরাং আলোচনার বিষয় হবে চাহিদা নয় সরবরাহ। এটাকেই সেঁই-এর বাজার তত্ত্ব বলা হয় এবং সেটাই আজকের supply-side economics (অথবা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগানের "রেগান-ইকনমিকস"-এর ভিত্তি দর্শন)।

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩): ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। যিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে স্টক (পুঁজি) বাজারে ব্যবসা করে বিপুল সম্পদের মালিক হন এবং আয়ারল্যান্ড থেকে ব্রিটেনের হাউস অব কমনস্‌ের একটি আসন কিনে ফেলেন। খাজনা তত্ত্ব ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের উদ্‌গাতা।

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩): ব্রিটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর "Principles of Political Economy" গ্রন্থটি মধ্য-উনবিংশ শতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সারমর্ম। বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত এটিই ছিল বিশ্বের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে একমাত্র পাঠ্যবই।

আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪): অর্থনীতির বিষয়বস্তুকে সহজ ছক-এর মাধ্যমে দেখানো, চাহিদা-সরবরাহের বিধি লিপিবদ্ধ করা, স্থিতিস্থাপকতার বিধান প্রণয়ন, অর্থশাস্ত্রে গণিতের ব্যবহার, অর্থনীতিশাস্ত্রকে আলাদা জ্ঞান-চর্চার বিভাগসহ এ শাস্ত্রে ডিগ্রি দেয়া – এসবের মাধ্যমে এই ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিশাস্ত্রকে উচ্চস্তরে তুলে আনেন।

আর্থার সেসিল পিগু (১৮৭৭-১৯৫৯): ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। প্রথম দিকে বলেছেন যে বিভিন্ন বাহ্যিক কারণে বাজার ফলপ্রদ নয়; আর সে কারণেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এরপরে বলেছেন যে রাষ্ট্রের অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপের কারণে শ্রমবাজারে স্বয়ংক্রিয় এডজাস্টমেন্ট বা সমন্বয় অকার্যকর হয়ে পড়লে বেকারত্ব বাড়ে।

জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬): আলফ্রেড মার্শাল ও সেসিল পিগুর ছাত্র। পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক মহামন্দার সময় (১৯২৯-১৯৩৩) যখন প্রচলিত অর্থশাস্ত্র দীর্ঘমেয়াদি ভাল-র লক্ষ্যে সরকারি ব্যয় কমানোর কথা বলতে থাকল, তখন কেইনস্ ঠিক উল্টোটা বললেন – সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে মোট চাহিদা বাড়ালে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। আরো বললেন, "দীর্ঘ মেয়াদে (in the long run) আমরা সবাই মৃত।"

লায়নেল রবিন্স (১৮৯৮-১৯৮৪): ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা প্রদানের জন্য খ্যাত।
পল স্যামুয়েলসন (১৯১৫-২০০৯): অর্থনীতির পাঠ্যগ্রন্থ "Economics"-এর জন্য খ্যাত। নয়া ধ্রুপদী সংশ্লেষবাদী যিনি অর্থশাস্ত্রে পদার্থবিজ্ঞানের থার্মোডিনামিকস্ প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছেন।

উৎস: *অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক বিনির্মিত।*

অধ্যায় ৩

অর্থনীতিশাস্ত্রে কে-কী-কেন বলেন?
সহজিয়া কথা

"আমি কাউকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে পারি না,
আমি তাদের চিন্তার খোরাক জোগাতে পারি মাত্র।"

সক্রেটিস, খৃ.পূ. ৪৬৯-৩৯৯

এ গ্রন্থটি যেহেতু সাধারণ পাঠকের উদ্দেশে রচিত – অর্থশাস্ত্রের পণ্ডিতদের উদ্দেশে নয় – সেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রের "বিষয়বস্তু" (যাকে বলে subject matter of Economics) নিয়ে মোটা দাগে কিছু কথা বলা আবশ্যক। অর্থনীতিশাস্ত্রে যাদের মূল ধারার প্রতিনিধি বা শাস্ত্রীয় পণ্ডিত বলা হয়ে থাকে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে কী বলেন (বলেছেন) এবং কেন বলেন (বলেছেন) সে বিষয়ে জানলে এগুনো সুবিধে হবে।

অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু কী অথবা কী হওয়া উচিত – এ নিয়ে শাস্ত্রীয় গুরুদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য নেই। আর এ ঐকমত্য থাকা না থাকা আবশ্যকও নয়। তবে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'বিষয়বস্তু' বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অন্তত এ জন্য যে অর্থনীতির সাথে দর্শনশাস্ত্র ও রাজনীতিবিজ্ঞানসহ সামাজিকবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার যোগসূত্র আছে অথবা ঐ যোগসূত্র স্থাপন জরুরি। আর এসব কারণেই অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা জরুরি। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা সঙ্গত হবে যে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু যে কী অথবা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে একাধিক বিশ্লেষণাত্মক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে – তবে গ্রন্থ তেমন নেই বললেই চলে।

আসা যাক অর্থনীতিশাস্ত্রের *বিষয়বস্তু* (subject matter of Economics) নিয়ে যা বলা হয় সেসব কথাবার্তা এবং একই সাথে এ গ্রন্থে আমি যা বলার চেষ্টা করেছি তার সাথে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তুর যোগসূত্রের বিষয়াদিতে। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে মর্মার্থগত ক্রমবিবর্তন হয়েছে। আর এ বিবর্তনে মোটামুটিভাবে ছয়টি নিয়ামক বিষয় নির্দেশ করা যেতে পারে। সে ছয়টি নিয়ামক বিষয় হলো:

১. ইতিহাসের নির্দিষ্ট কালপর্বের বাস্তব সমস্যাদি অনুসন্ধান ও কার্যকারণ বিশ্লেষণ;

২. অর্থনীতিশাস্ত্রকে সামাজিকবিজ্ঞানের অন্যান্য শাস্ত্র থেকে শুধু ভিন্ন করার প্রয়াসই নয় অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের প্রয়াস;

৩. অর্থনীতিশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের রূপ দেবার প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে এমনকি পদার্থবিজ্ঞান অথবা রসায়নশাস্ত্র অথবা জীববিজ্ঞানের সাথে তুলনার প্রয়াস লক্ষণীয়;

৪. সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক কালকে সমর্থন দেবার প্রয়াস (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই);

৫. বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে মুক্তবাজার অর্থনীতিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক সিস্টেমকে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত, সবচেয়ে ফলপ্রদ এবং প্রাকৃতিকভাবেই সবচেয়ে কার্যকর সিস্টেম হিসেবে প্রমাণের প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যা-ই বলা হোক না কেন; এবং

৬. কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে দূর-মেয়াদে অকার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণের প্রয়াস।

অর্থনীতিশাস্ত্রের *বিষয়বস্তু* কী? এ নিয়ে দেশ-বিদেশের পাঠ্যপুস্তকে যা বলা হয়, তা শাস্ত্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তন অনুসারে স্বল্প কথায় নিম্নরূপ (শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের কয়েকজন সম্পর্কে দেখুন প্রদর্শ ৩)। ***অর্থশাস্ত্র হলো:***

১. "গার্হস্থ্য বিষয়াদি-সংশ্লিষ্ট বিদ্যা" (জেনোফেনস, খ্রি.পূ. ৪৩০-৩৫৪; এ্যারিস্টটল, খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)।

২. "সম্পদের বিজ্ঞান" (ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম জনক এডাম স্মিথ, ১৭২৩-১৭৯৪; রবার্ট ম্যালথাস, ১৭৬৬-১৮৩৪; জ্যাঁ-বাতিস্ত সেঁই, ১৭৬৭-১৮৩২; ডেভিড রিকার্ডো, ১৭৭২-১৮২৩; জন স্টুয়ার্ট মিল, ১৮০৬-১৮৭৩)।

> এডাম স্মিথের মতে, "অর্থশাস্ত্র – জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।" জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য বলছেন, "অর্থশাস্ত্র হলো সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রায়োগিক বিজ্ঞান।"

৩. "কল্যাণের বিজ্ঞান" (নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিদদের মতে যার মধ্যে আছেন আলফ্রেড মার্শাল, ১৮৪২-১৯২৪; হার্বার্ট ডেভেনপোর্ট, ১৮৬১-১৯৩১; আর্থার সেসিল পিগু, ১৮৭৭-১৯৫৯)।

> আলফ্রেড মার্শালের মতে, "অর্থশাস্ত্র মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কর্মকাণ্ডের আলোচনা করে।"

৪. "অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান"

> লায়নেল রবিনস (১৮৯৮-১৯৮৪) এতকালের প্রচলিত ধারণা বাতিল ঘোষণা করে বললেন, "অর্থশাস্ত্র মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবস্থার যোগ্য সীমিত সম্পদের সম্পর্ক-বিষয়ক মানুষের স্বভাব-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে।" অর্থাৎ সম্ভবত 'সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা' (scarcity) ("মানুষের অসীম অভাব") এবং 'পছন্দ বা বাছাই' (choice) – এ দুটি বিষয়কে এইই প্রথম অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রধান বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হলো (এ প্রস্তাব সঠিক না বেঠিক – তা আপাতত বিচার্য বিষয় নয়)।

৫. "কর্মসংস্থান ও আয় – এ দুয়ের সম্পর্ক নির্ধারণী বিজ্ঞান" – এ কথা বলেছেন জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬)।

৬. "পছন্দের বিজ্ঞান" বা "বাছাই করে নেবার বিজ্ঞান" ("Economics is the science of choice")।

> "দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে সমাজ কীভাবে মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে এবং তা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বণ্টন করতে পারে – এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান" – এসব বলছেন পল স্যামুয়েলসন (১৯১৫-২০০৯)।

সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্রের *বিষয়বস্তুর* বিচার্য বিষয়ের বিবর্তনে যা দেখা যায় তা হলো অর্থনীতিশাস্ত্র আদিতে "গার্হস্থ্য বিষয়াদির" (যা Oiko এবং nomos অর্থাৎ খানা/পরিবার এবং চর্চা/আলোচনা/বিজ্ঞান, যাকে বলা হতো Oikonomia অথবা Oeconomicus) বিদ্যা থেকে 'সম্পদের বিজ্ঞান' হয়ে 'কল্যাণের বিজ্ঞান' পার হয়ে এখন "অপ্রাচুর্য-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে" রূপান্তরিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে এরকম: সমাজে সম্পদ আছে অপ্রতুল অথবা 'সম্পদ' হলো দুষ্প্রাপ্য, আর দুষ্প্রাপ্য এ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারই (অবশ্য কার জন্য 'সর্বোত্তম' তা স্পষ্ট নয়) হলো অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বভাব-আচরণ-পছন্দ-বাছাইসহ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদিও একই সাথে বিচার্য। শেষ পর্যন্ত অর্থশাস্ত্রের বিষয় বলতে যা বুঝানো হচ্ছে তা হলো এ রকম: মানুষের জীবনে তিনটি মৌলিক সমস্যা আছে: (১) অপ্রাচুর্যের সমস্যা, (২) পছন্দ বা নির্বাচন বা বেছে নেয়ার সমস্যা, (৩) বিনিময়। এর অর্থ হলো মানুষের অভাব (want) অসীম আর অভাব মেটানোর উপকরণ পর্যাপ্ত নয় অর্থাৎ এসবের অপ্রাচুর্যতা আছে অথবা এসব দুষ্প্রাপ্য (scarcity); আর এ দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রাচুর্যতার কারণেই নির্বাচন বা পছন্দ বা বাছাইয়ের (choice) প্রশ্ন ; আর যেহেতু প্রয়োজনের গুরুত্বানুযায়ী বেছে নেয়ার প্রশ্ন আছে, সেহেতু 'বিনিময়' (exchange)-এর প্রশ্ন।

অর্থশাস্ত্রের *বিষয়বস্তুর* মর্মার্থ নিয়ে যদিও এ গ্রন্থের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আলোচনা হবে তারপরও বলে রাখি:

১. এডাম স্মিথ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে সম্পদ এবং সম্পদের 'মূল্য' নিয়ে যুক্তিসঙ্গত চূড়ান্ত কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

২. আলফ্রেড মার্শাল যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে মানবকল্যাণ করে না এমন কোনো কিছুই অর্থশাস্ত্রের বিষয় নয়।

৩. লায়নেল রবিনস যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে মানবকল্যাণ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং সামাজিক বিষয়াদি প্রতিফলিত হয় না।

অর্থনীতিশাস্ত্রের *বিষয়বস্তু* নিয়ে যেমন বহুমত তেমনি শাস্ত্রের *পরিধি* (যাকে বলে scope) নিয়েও ভিন্নমত আছে। কেউ বলেন অর্থনীতিশাস্ত্র সমাজবিজ্ঞান, আবার কেউ বলেন এ শাস্ত্র মানুষের সব ধরনের কার্যকলাপ আলোচনা করে না; কেউ বলেন এ শাস্ত্রের কাজ শুধু সমস্যার বিশ্লেষণ করা। আবার কেউ কেউ বলেন শুধু বিশ্লেষণই নয় সমস্যার সমাধানের পথও নির্দেশ করা উচিত; কেউ কেউ বলেন ভাল-মন্দ উচিত-অনুচিত বিচার অর্থনীতিশাস্ত্রের কাজ নয় (যেমন কেউ কেউ বলেন একজন ভোক্তার মদ পান না করে দুধ পান করা উচিত কি না তা অর্থনীতিশাস্ত্রবিদদের চিন্তার বিষয় নয়, তা দার্শনিকের বিষয় হতে পারে); কেউ কেউ বলেন অর্থশাস্ত্রের কাজ হলো, যা ঘটেছে বা ঘটতে পারে সে বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা (অর্থাৎ positive science) – কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বিচারমূলক ভাবনা-চিন্তা করা নয় (যা কিনা normative science এর বিষয়); কেউ কেউ আবার অর্থনীতিশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলেন (যেহেতু এ শাস্ত্রে সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তু পরিমেয়); আবার কেউ এ শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলতে নারাজ এ যুক্তিতে যে মানব আচরণ পরিমাপযোগ্য নয় এবং এ নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ বিপজ্জনক এবং অর্থশাস্ত্রের সূত্রসমূহ যথেষ্ট অনুমাননির্ভর। সুতরাং সহজ কথা হলো অর্থশাস্ত্রের *বিষয়বস্তু* (subject matter) ও *পরিধি* (scope) নিয়ে গুরুতর মতভেদ আছে – আছে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতামত।

অর্থশাস্ত্র যে বিজ্ঞান এ কথা বুঝাতে কেউ কেউ রসায়নশাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে রসায়নশাস্ত্রে যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংমিশ্রণে জল পাওয়া যায় (অর্থাৎ হাইড্রোজেন, H_2 + অক্সিজেন, O = H_2O, জল) তেমনি অর্থনীতিশাস্ত্রে "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত" (এ কথাটি অর্থনীতিশাস্ত্রীদের খুবই পছন্দের – যাকে বলে *ceteris paribus*) থাকলে দাম (price) বাড়লে চাহিদা (demand) কমবে। আর এ যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে রসায়নশাস্ত্রে এ বিধান যদি প্রাকৃতিক বিধি হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে অর্থশাস্ত্রের চাহিদা-সরবরাহের বিধিও প্রাকৃতিক বিধি। আসলে অর্থশাস্ত্র নিয়ে এ কথাটি আদৌ সত্য নয় অথবা বিজ্ঞানসম্মত নয় – ধারণাটি নিউটনীয়-একরৈখিক-যান্ত্রিক (Newtonian linear-mechanistic) এবং ঐতিহাসিক সত্য-বিবর্জিত। সাধারণ-সহজ-প্রচলিত 'বাজার অর্থনীতির' আগে বিনিময়ের রূপ কী ছিল? অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কি মানব ইতিহাসে সব সময় ছিল? 'বিনিময়' (exchange) কি চিরন্তন? মূল্য বা price কি সর্বজনীন বিষয়? এসব বিষয়ে আমি চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি।

অর্থশাস্ত্রের বিবর্তনে শাস্ত্র এখন যে জায়গায় এসে হাজির হয়েছে সে প্রশ্ন বিচারের আগে বলা সঙ্গত যে এ শাস্ত্রের সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার (অর্থাৎ যাকে প্রচলিত অর্থে 'শাস্ত্রই' বলে) পারস্পরিক সম্পর্ক বা যোগসূত্র কী। এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে অর্থশাস্ত্রের সাথে নীতিশাস্ত্র (যা দর্শনশাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ), ইতিহাস, রাজনীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

গ্রিকরা অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের সম্পদ বৃদ্ধির কৌশল বলে মনে করতেন; ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জন্ম হয়েছে নীতিশাস্ত্র থেকে; ইতিহাস থেকেই একদিকে যেমন নির্ণীত হয় বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি আবার ইতিহাস থেকেই বিচার করা যায় অতীতের অর্থশাস্ত্রের সূত্র-বিধির যথার্থতা; অর্থনীতিশাস্ত্রে মানব আচরণ-স্বভাব-পছন্দ-অপছন্দের বিষয়াদি যেখানেই আসবে, সেখানেই মনোবিজ্ঞান-এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক (এসবের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ উদাহরণ Neuroeconomics); গণিতশাস্ত্র বিশেষত পরিসংখ্যানবিজ্ঞান ছাড়া অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত আয়-ব্যয়-উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পরিভোগ-কর্মসংস্থান-বেকারত্ব-মজুরি-মুদ্রাস্ফীতি এসবের তথ্য-উপাত্তভিত্তিক কোনো হিসেবপত্তর প্রণয়ন সম্ভব নয়। এসব থেকে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে যে অর্থনীতিশাস্ত্রকে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শাস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated) এবং কামরাভুক্ত (compartmentalised অর্থে) শাস্ত্র হিসেবে বিচার করলে ভুল হবে। তাতে করে অর্থনীতিশাস্ত্র অতি সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ হতে বাধ্য।

যেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রে "দর্শনের দারিদ্র্য" নিয়ে কথা, সেহেতু যুক্তিসঙ্গত কারণেই এ শাস্ত্রের অন্তর্গত বহুমত-পথ নিয়ে কিছু বলা জরুরি। বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ধরুন আপনি এক জনবহুল শহরে বা নগরে এইই প্রথম আসলেন, কিন্তু আপনার কাছে ঐ শহরের কোনো ম্যাপ (মানচিত্র) নেই। ধরুন ঐ শহরের নাম 'অর্থনীতি'। এ নগর বা শহরের ম্যাপ (মানচিত্র) না থাকলে আপনার শহর ভ্রমণ সহজসাধ্য হবে না। এ কথা মাথায় রেখেই 'অর্থনীতি শহরে' আপনার ভ্রমণের সুবিধার্থে একটা ম্যাপ (মানচিত্র) প্রণয়ন করেছি। এ ম্যাপটিই ছক ১-এ দেখানো হয়েছে। ম্যাপটি তুলনামূলক সহজ-সরল বিধায় সরলীকরণের আপদ-বিপদ থাকতে পারে; তবে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই (কারণ এ গ্রন্থটি বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের জন্য প্রণয়ন করিনি)। অর্থনীতি নামক শহরের এই ম্যাপে আমি যা যা দেখানোর চেষ্টা করেছি তা হলো – এ শহরের উৎপত্তি কবে, উৎপত্তিকাল থেকে এখন পর্যন্ত এ শহরের প্রধান স্থাপনাগুলো কী কী, ঐসব স্থাপনা কবে বিনির্মিত হয়েছিল, এবং ঐসব স্থাপনার বৈশিষ্ট্য কী অর্থাৎ অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসের মূল ধারাগুলো অথবা মূল মতবাদগুলো কী এবং প্রত্যেকে মূল বিষয়াদি নিয়ে কী বলেন (এসব যেহেতু ছক ১-এ দেখানো হয়েছে সেহেতু বিস্তারিত বিবরণে যাবার প্রয়োজন নেই)। আর এক বাক্যে প্রতিটি মতবাদ নিয়ে বলার চেষ্টা করেছি এ জন্য যে তা হলে হয়তোবা মনে রাখা এবং একের সাথে অন্যের পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ হবে।

ছক ১: অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশে বিভিন্ন মত-ধারার স্কুলের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকীয় মূল কথা

মূল বিষয়াদি (প্রশ্নসমূহ)	ধ্রুপদী/চিরায়ত উদারপন্থী স্কুল (Classical)	মার্কসবাদী স্কুল (Marxian)	নয়া-ধ্রুপদী স্কুল (Neo-Classical)	প্রতিষ্ঠানবাদী স্কুল (Institutional)	অস্ট্রিয়ান স্কুল (Austrian)	কেইনসিয়ান স্কুল (Keynesian)	আচরণবাদী স্কুল (Behaviouralist)
১। অর্থনীতি কী নিয়ে গঠিত...	শ্রেণিসমূহ	শ্রেণিসমূহ	ব্যক্তি	ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি	শ্রেণিসমূহ	ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান
২। একক ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য...	স্বার্থপর – স্বস্বার্থ দেখে এবং যুক্তিনিষ্ঠ ('যুক্তি' শ্রেণি অবস্থান দিয়ে নির্ধারণ হয়)	সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াকু শ্রমিকশ্রেণি ছাড়া অন্যেরা স্বার্থপর এবং যুক্তিনিষ্ঠ	স্বার্থপর এবং যুক্তিনিষ্ঠ	বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত (প্রবৃত্তি-অভ্যাস-বিশ্বাস-যুক্তি)	স্বার্থপর এবং বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত; ব্যক্তি প্রচলিত প্রথা মেনে চলে	যুক্তিনিষ্ঠ নয়; স্বার্থপরতার প্রশ্নে দ্বৈততা আছে	সীমানার মধ্যে বিন্যস্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ
৩। অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-ক্ষেত্র...	উৎপাদন	উৎপাদন	বিনিময় ও ভোগ	শক্ত কোনো মত পোষণ করে না, তবে নয়া-ধ্রুপদীবাদীদের তুলনায় 'উৎপাদন'-এ গুরুত্ব দেয়	বিনিময়	দ্ব্যর্থক-অস্পষ্ট; তবে কারো কারো মতে উৎপাদন	শক্ত কোনো মত পোষণ করে না, তবে 'উৎপাদন'-এর দিকে বেশি ঝোঁক
৪। অর্থনৈতিক পরিবর্তন যার মাধ্যমে ঘটে...	পুঁজির সঞ্চয়ন (বিনিয়োগ)	শ্রেণিসংগ্রাম, পুঁজির সঞ্চয়ন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশ	ব্যক্তির পছন্দ	ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তক্রিয়া	ব্যক্তির পছন্দ তবে তা প্রচলিত প্রথার অন্তঃস্থিত	দ্ব্যর্থক-অস্পষ্ট; অর্থনীতিবিদদের উপর নির্ভরশীল	শক্ত কোনো মত পোষণ করে না
৫। 'বিশ্ব' কেমন...	নিশ্চিত ('লৌহ বিধি')	নিশ্চিত ('গতির সূত্র মেনে চলে')	পরিমাপযোগ্য ঝুঁকিসহ নিশ্চিত	জটিল ও অনিশ্চিত	জটিল ও অনিশ্চিত	অনিশ্চিত	জটিল ও অনিশ্চিত
৬। নীতিগত বা পলিসিগত সুপারিশ	মুক্ত বাজার	সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা	মুক্তবাজার অথবা বাজারে হস্তক্ষেপ (নির্ভর করবে 'বাজার ব্যর্থতা' এবং 'সরকারের ব্যর্থতা'র ওপর)	দ্ব্যর্থক-অস্পষ্ট; অর্থনীতিবিদদের উপর নির্ভর করে	মুক্ত বাজার	সক্রিয় আর্থিক নীতি এবং দরিদ্রমুখী আয় বণ্টন	শক্ত কোনো মত পোষণ করে না; তবে সরকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য

উৎস: অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস পাঠে গ্রন্থকারের নিজস্ব মত।

আপনি 'অর্থনীতি' নামক যে শহরে এখন ভ্রমণ করছেন ঐ শহরে অনেকগুলো স্থাপনা আছে। অর্থনীতির শহরবাসীরা শহরের প্রত্যেক স্থাপনাকে "স্কুল" বলে থাকেন। ঐতিহাসিক গুরুত্বের মাপকাঠিতে ঐতিহাসিক কালানুযায়ী 'অর্থনীতি শহরের' প্রধান ৭টি স্থাপনা বা স্কুলের নাম যথাক্রমে: ধ্রুপদী বা চিরায়ত উদারপন্থী স্কুল (স্থাপনকাল[৭] ১৭৫৯-১৭৭৬), মার্কসীয় স্কুল (স্থাপনকাল ১৮৪৮-১৮৬৭), নয়া-ধ্রুপদী স্কুল (স্থাপনকাল ১৮৭০-১৮৯০), প্রতিষ্ঠানবাদী স্কুল (স্থাপনকাল ১৯১৮-এর দিকে), অস্ট্রিয়ান স্কুল (স্থাপনকাল ১৯২০-১৯৩০-এর দিকে), কেইন্‌সিয়ান স্কুল (স্থাপনকাল ১৯২৯-১৯৩৭-এর দিকে) এবং আচরণবাদী স্কুল (স্থাপনকাল ১৯৪০-১৯৫০-এর দিকে)।

অর্থনীতি শহরের উল্লিখিত ৭টি স্কুলের যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা অর্থনীতি শহরের মূল বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্নভাবে ভাবেন – এসব নিয়ে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এক নয়। তাঁদের ভাবনার মূল প্রশ্নাদি যা নিয়ে বিবর্তিত তার মধ্যে প্রধান হলো: তাঁদের শহরটি (অর্থাৎ "অর্থনীতি শহর') কী নিয়ে গঠিত (?); তাদের সমাজে একক ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য কী (?); তাদের অর্থনীতি শহরের সবচে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-ক্ষেত্র কী (?); তাদের "অর্থনীতি শহরে" পরিবর্তন সাধন কে করেন (?); তাদের শহর তো বুঝলাম কিন্তু তাদের মতে বিশ্বটা কেমন (?); এবং তারা তাদের শহরের উন্নতির জন্য কী সুপারিশ করেন (?)। উল্লিখিত প্রশ্নগুচ্ছের প্রতিটি নিয়ে কোন স্কুল কী ভাবনাচিন্তা করে – তা ছক ১-এ (অর্থাৎ শহরের মানচিত্রে) দেখানো হয়েছে।

অর্থনীতি নামক শহরের মানচিত্রটি যখন একটু বোঝা গেল। তখন যেমনটি আগে বলেছি এ শহরের যে প্রধান ৭টি স্কুল আছে ঐ স্কুলের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য একবাক্যে প্রকাশ করলে শহরটির পথঘাট আরো বেশি করে জানতে-বুঝতে সুবিধে হবে। তবে এর আগে বলে রাখি এ শহরের স্কুলগুলো যা পড়ায় তার মধ্যে কেন যেন কয়েকটি বিষয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যার মধ্যে আছে 'বাজার', 'উৎপাদক', 'ব্যক্তি', 'শ্রেণি', 'প্রতিযোগিতা', 'পুঁজিবাদ', 'ব্যক্তিমালিকানা', 'সমাজ', 'পছন্দ', 'স্বাধীনতা', 'নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তা', 'উৎপাদন', 'বিনিয়োগ', 'ভোগ', 'সরকার'।

এখন অর্থনীতি নামক শহরের প্রধান স্কুলগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য একবাক্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করা যাক। নিচে একবাক্যে বলার চেষ্টা করছি কোন স্কুল কী বলছে –

১. *ধ্রুপদী বা চিরায়ত স্কুল* (Classical School) বলছে: *"যেহেতু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারই সব উৎপাদককে সজাগ করে দেয়, সেহেতু বাজারকে ঘাঁটিও না; ওকে একা থাকতে দাও।"*

২. *মার্কসীয় স্কুল* (Marxian School) বলছে: *"পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক প্রগতির শক্তিশালী বাহন, কিন্তু তা ভেঙ্গে পড়বে; কারণ উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাটাই একপর্যায়ে এ প্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়াবে।"*

৩. *নয়া-ধ্রুপদী স্কুল* (Neo-Classical School) বলছে: *"একক-ব্যক্তিসত্তা জানে যে সে কী করছে, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বাজার অকার্যকর না হচ্ছে ততক্ষণ বিরক্ত না করে তাকে তার মতো থাকতে দাও।"*

৪. *প্রতিষ্ঠানবাদী স্কুল* (Institutional School) বলছে: *"ব্যক্তি যদিও তাদের সমাজের বিধিবিধান পরিবর্তন করতে সক্ষম, তথাপি ব্যক্তি ঐ সমাজেরই সৃষ্ট।"*

---

[৭] বিভিন্ন স্কুলের স্থাপনকাল (অথবা প্রতিষ্ঠাকাল) নির্ধারণ তর্কাতীত বিষয় নয়। তবে এক্ষেত্রে আমি যেসব তথ্য বিবেচনা করেছি তা হলো নিম্নরূপ: ধ্রুপদী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে আছেন এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০), ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩), জ্যাঁ-বাপ্তিস্ত সেঁই (১৭৬৭-১৮৩২) এবং রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)। এ স্কুলের যাত্রা শুরু এডাম স্মিথের "Theory of Moral Sentiment" (১৭৫৯ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থ, যা ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত মহাগ্রন্থ "Wealth of Nations"-এর ভিত্তি। মার্কসীয় স্কুলের যাত্রা শুরু ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচিত 'কম্যুনিস্ট ইশতেহার' দিয়ে যা পরিণত রূপ পায় ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত মার্কসের মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' (এর প্রথম খণ্ড) দিয়ে। নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন উইলিয়াম জেভন্‌স (১৮৩৫-১৮৮২), লিও ওয়াল্‌রাস (১৮৩৪-১৯১০), আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪)। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭০-১৮৯০ সময়কালে; ১৮৯০ সালে আলফ্রেড মার্শালের "Principles of Economics" গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। প্রতিষ্ঠানবাদী স্কুলের একক প্রতিষ্ঠাতা থরস্টেইন ভেবলেন (১৮৫৭-১৯২৯) এবং বলা হয়ে থাকে যে ১৯১৮ সালে এ স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় (এটা সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লবের ঠিক পরের বছর)। অস্ট্রিয়ান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কার্ল মেন্‌জার (১৮৪০-১৯২১), লুদভিগ্‌ ভন মিজেস্‌ (১৮৮১-১৯৭৩) এবং ফ্রেডরিখ ভন হায়েক (১৮৯৯-১৯৯২)। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কার্যকারিতা-সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ করে এ স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯-১৯৩০-এর দশকে যা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৪৪ সালে ভন হায়েক্‌-এর "The Road to Serfdom" গ্রন্থটি প্রকাশের পর। কেইনসিয়ান স্কুলের একক প্রতিষ্ঠাতা জন মেইনার্ড কেইনস্‌(১৮৮৩-১৯৪৬), যিনি পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক মহামন্দা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে ১৯২৯-৩৭ এর দিকে পথ-পদ্ধতি নির্দেশ করেন। আচরণবাদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪০-১৯৫০-এর দশকে এবং এ স্কুলের প্রধানতম প্রতিষ্ঠাতা হাবার্ট সাইমন (১৯১৬-২০০১)।

৫. *অস্ট্রিয়ান স্কুল* (Austrian School) বলছেঃ *"যেহেতু কেউই যথেষ্ট জানেন না সেহেতু সবাইকে একা থাকতে দাও।"*

৬. *কেইনসিয়ান স্কুল* (Keynesian School) বলছেঃ *"একক ব্যক্তির জন্য যা মঙ্গল, তা সমগ্র অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।"*

৭. *আচরণবাদী স্কুল* (Behaviouralist School) বলছেঃ *"আমরা যেহেতু যথেষ্ট ধোপদুরস্ত নই সেহেতু সচেতনভাবেই নিয়মকানুন প্রণয়ন করে আমাদের নিজ পছন্দের স্বাধীনতা সীমিত করা প্রয়োজন।"*

এতক্ষণ আমরা জানলাম – অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু, পরিধি, অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে অর্থশাস্ত্রের সম্পর্ক, অর্থনীতি নামক শহরের প্রধান স্কুলগুলোর বিবরণ অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন মত-ধারার স্কুলের নামধাম স্থাপনাকালসহ মূলকথা এবং একবাক্যে প্রতিটি স্কুলের মূল বৈশিষ্ট্য। আসা যাক পরবর্তী যৌক্তিক পর্বে। অর্থশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' কোথায় ? – এ প্রসঙ্গে।

অধ্যায় ৪

অর্থনীতিশাস্ত্রের মূল ধারাসমূহ: শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের স্বরূপ

"প্রতিটি যুগের নিয়ামক ধ্যান-ধারণাগুলি সবসময়ই
ঐ যুগের শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণা মাত্র।"

কার্ল মার্কস, ১৮১৮-১৮৮৩

এর আগে 'অর্থনীতি' নামক শহরের সাতটি প্রধান স্কুলের কথা বলেছি। এখন একটু অন্যভাবে বলি: অর্থনীতিশাস্ত্রে ধারা-উপধারার কমতি নেই। যুগ বিভাজনের মাপকাঠিতে অর্থশাস্ত্রের মূল ধারাসমূহকে প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বিভাজিত করা হয়ে থাকে। আর তারই সাথে সঙ্গতি রেখে, ধারা-সংশ্লিষ্ট যেসব নাম ও মতবাদ (চিন্তাধারার বর্গ বা স্কুল) নিয়ে আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো প্রাচীন যুগের – চীনা কনফুসিয় মতবাদ, ভারতীয় চার্বাক দর্শন ও চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, গ্রিস-রোমের জেনোফনেস, এ্যারিস্টটল, প্লেটো; মধ্যযুগের বাণিজ্যবাদ, ফিজিওক্রাট ফ্রাঁসুয়া কেনে; উদারপন্থী – ডাড্‌লি নর্থ, ডেভিড হিউম, জন লক্; ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রের – উইলিয়াম পেটি, রবার্ট ম্যালথাস, ডেভিড রিকার্ডো, এডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্‌থাম, জ্যাঁ বাটিস্ট সেঁই; মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের কার্ল মার্কস; কেইনসিয় অর্থশাস্ত্রের জন মেইনার্ড কেইনস্ প্রমুখ।

প্রদর্শ ৪: কনফুসিয়াস, চাণক্য, জন লক্, ডাড্‌লি নর্থ, ডেভিড হিউম

কনফুসিয়াস (খ্রি.পূ. ৫৫১-৪৭৯): চীনের প্রাচীন সামাজিক ও ধর্মীয় নেতা-দার্শনিক। সামাজিক ও শৃংখলাবোধ দিয়ে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষায় উপদেশ দিয়েছেন। কনফুসিয়বাদ বিভিন্ন ধারা-উপধারায় বিভক্ত। এক ধারা বলে বিশ্বের সবকিছু ঈশ্বরের বিধান মতে চলে। আর অন্য ধারা বলে বিশ্বের মূলে আছে 'লী' এবং 'চী'-র দ্বন্দ্ব। 'লী' হচ্ছে ভাব, আর 'চী' হচ্ছে বস্তু। 'লী'-র কারণে মানুষের মধ্যে মহত্ত্বের সৃষ্টি আর 'চী'-র কারণে লোভ, মোহ, ইন্দ্রিয় সুখ ইত্যাদির কাছে আত্মসমর্পণ। কনফসিয়াস-এর মতবাদ বিশ্লেষণে অর্থশাস্ত্রের দার্শনিকেরা বলেন যে ঐ মতবাদ অনুযায়ী: লোভ ছাড়াও প্রবৃদ্ধি সম্ভব; মারণাস্ত্রের গুণাগুণ-এর চেয়ে জনমানুষের গুণাগুণ গুরুত্বপূর্ণ; "অর্থনৈতিক উন্নয়ন"-এর আগে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে; চাকরির ক্ষেত্রে বেতনকে একমাত্র লক্ষ্য মনে করলে তা হবে লজ্জাকর; ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্রপাতি গুরুত্বপূর্ণ।

চাণক্য (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র) (খ্রি.পূ. ৩৭১-২৮৩): কৌটিল্য ছিলেন একীভূত ভারতবর্ষের মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণমন্ত্রী। তাঁর প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি চণকমুণির পুত্র বা তাঁর বংশীয় ছিলেন বিধায় তাঁর অপর নাম চাণক্য। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বহু শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তক্ষশিলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রকে 'গ্রন্থ' না বলে অনেকেই 'গ্রন্থাগার' বলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে বলা হয় রাজনীতি, রাজ্যশাসন প্রণালী, অর্থনৈতিক নীতিমালা, দণ্ডনীতি ও যুদ্ধকৌশল নীতি-বিষয়ক গ্রন্থ।

জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪): বৃটিশ দার্শনিক। তিনিই প্রথম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (private property) পক্ষে এবং রাষ্ট্রের সীমিত হস্তক্ষেপের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এর ফলে সপ্তদশ শতকে ব্রিটেনে ধর্মীয় বাধা-বিপত্তির মুখে উঠতি পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার পক্ষে দার্শনিক যুক্তি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-সম্পর্কিত জন লক্-এর এ যুক্তিই পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে উদারপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

ডাড্‌লি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১): ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং মুক্তবাণিজ্যের প্রবক্তা।

ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬): স্কটিশ দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ। দর্শনশাস্ত্রে অজ্ঞেয়বাদী অর্থাৎ মনে করতেন মানুষের পক্ষে বস্তু-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। অর্থনীতিশাস্ত্রের ভ্রুণাবস্থায় অবদান রেখেছেন। অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ে তাঁর অবদান মৌলিকত্বের দাবি রাখে।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

উপরে যেসব নাম ও ধারার কথা বললাম এদের মধ্যে দু-একটি ব্যতিক্রম, যেমন সঙ্গতি বিশ্লেষক এডাম স্মিথ আর দ্বন্দ্ব সংঘাত বিশ্লেষক কার্ল মার্কস (ছক ১-এর প্রথম দুই স্কুল) ছাড়া কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে তেমন উচ্চতায় উঠতে সক্ষম হননি, কেউই তেমন উচ্চতায় উঠে মানব জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিরিখে বড় পর্দায় অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সাধারণ সূত্র বিনির্মাণ করতে সক্ষম হননি। বিপরীতে প্রায় প্রত্যেকেই সম্পদ, বাজার, উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সমীকরণ, রাষ্ট্র ও সরকারসহ উপরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠান – যুগ-পর্দায় এসবের সমসাময়িক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, কখনও বা তুলনামূলক সামষ্টিক – বড় পর্দায় কখনও বা ব্যক্তিক – ছোট পর্দায়। ফলে এদের হাতে অর্থশাস্ত্র কখনও প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের রূপ লাভ করেনি (এখানে 'বিজ্ঞান' অর্থ "প্রকৃতি বিজ্ঞান" অথবা "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান")। এ প্রসঙ্গে এমনকি এমনও বলা হয় যে মৌলিকত্বের বিচারে অর্থশাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস এবং জন মেইনার্ড কেইনস্ ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন "তাঁদের বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কারণে নয়, বরং প্রধানত তাঁদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সামাজিক দর্শনের জন্যই।"[৮]

সুতরাং যা আগেও বলেছি তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি হলেও বলা দরকার যে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা (অর্থাৎ অর্থনীতি স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা) যে সময়ে-যে যুগে-যে জগতের অংশ ছিলেন অর্থশাস্ত্রে তারা প্রধানত সে সময়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণ-এর চেষ্টা করেছেন। যেসব তত্ত্ব যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে আর টেকেনি, অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। আমার মতে এটাই অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্যের উৎস কথা। অর্থাৎ বিষয়টি এ রকম যে অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করা মানুষদের কেউই সময়ের ঊর্ধ্বে উঠে সবসময়ের-সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ সূত্র বিনির্মাণ করতে সক্ষম হননি (এ প্রসঙ্গে পরে আসব)।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছি – মানুষের বিবর্তন ইতিহাস ৫০ লক্ষ বছর। আর আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বয়স তার চেয়ে একটু কম, এবং তাও ৪৯ লক্ষ ৯০ হাজার বছর। কিন্তু আজ থেকে ৫০০ বছর আগেও আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদ বলতে তেমন কারো সাক্ষাৎ মেলা ভার এবং তখন অর্থনীতিশাস্ত্রটা ছিল মূলত নৈতিক দর্শনের অথবা নীতিশাস্ত্রীয় দর্শন অথবা ইতিহাসশাস্ত্রের (moral philosophy বা history) একটি শাখা মাত্র।[৯] যে শাখায় অর্থনীতিশাস্ত্রের বিবেচ্য বিষয় ছিল সম্পদ সৃষ্টির উৎস নির্ণয় থেকে শুরু করে সম্পদ বৃদ্ধির পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করা; এ লক্ষ্যে মুক্ত বাজার অথবা বাজারে রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপের পথ-পদ্ধতি-ক্ষেত্রসমূহ বাতলে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট করব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য বা এ ধরনের বিষয়াদি নিয়ে 'তাগিদমূলক' বা 'sponsored' চর্চা করা। আর আধুনিক যুগে আজ এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-পুনঃবণ্টন-ভোগ/পরিভোগের আন্তঃসম্পর্ক পুনঃউদ্‌ঘাটনসহ ধনী-দরিদ্র, দারিদ্র্য-বৈষম্য, দৈবঘটনার জগৎ (world of doubt and chance), বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ববাজার, বৈশ্বিক সম্পদ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক মুদ্রা, বৃহদাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বৃহদাকার সরকার, বৃহদাকার ইউনিয়ন, যোগাযোগ, তথ্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ-প্রতিবেশ-জলবায়ু ইত্যাদি। এসবকে বলা হয় সময়ের চাহিদা অথবা সময়ের দাবি। বিজ্ঞানের পথ না মাড়িয়ে শুধু সময়ের চাহিদা অথবা সময়ের দাবি মেনে নিয়ে সমসাময়িক জগতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সময় নষ্ট করে আবারও ভুল করছে অর্থনীতিশাস্ত্র। আসলে ফাঁদে পড়েছে অর্থনীতিশাস্ত্র। ফাঁদ পেতেছে এক মেরুর বিশ্বে – সাম্রাজ্যবাদ, আর সেই ফাঁদে অর্থনীতিশাস্ত্রের সবাইকে ঢুকতে বাধ্য করছে এখনকার নয়া-উদারবাদী (Neo-liberal) অর্থনীতি দর্শন (বিষয়টি পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে)। সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য আবারও চলতে থাকবে এবং সম্ভবত বেশ সময় ধরে এ দারিদ্র্যের গতির হার হবে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিক। আর এ হার যে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি হবে তার

---

[৮] Daniel. R. Fusfeld. 1982. The Age of the Economist. Illinois: Scott, Foresmen and Company. পৃ. ৩। ড্যানিয়েল ফাসফেল্ডের মূল্যবান এ গ্রন্থের খুবই ভাল অনুবাদ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপণন বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক, অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক (দেখুন, অর্থনীতিবিদের যুগ, ১৯৯১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি)।

[৯] ১৯০২ সাল পর্যন্ত অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রি দেবার প্রচলন ছিল না। ঐ সময় পর্যন্ত অর্থনীতি বিষয়টি নীতিশাস্ত্র অথবা ইতিহাস-এর উচ্চতর পর্যায়ের ডিগ্রি প্রাপ্তির শর্তাধীন একটি বিষয় ছিল। ১৯০৩ সালে, আলফ্রেড মার্শাল অনেক বছরের তদ্বিরের পরে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভিন্ন ডিগ্রির ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে ডিগ্রির প্রবর্তন হয়।

সম্ভাব্য কারণ অনেক। এসবে আপাতত মূল কারণ হবে: এক মেরুর বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য-কর্তৃত্ব চালিয়ে যাওয়ার প্রায়োগিক বিষয়াদি। এবং সম্ভবত এসবে ছেদ পড়বে না ততদিন, যতদিন বৈশ্বিক পুঁজিবাদ সদর্পে বিচরণ করতে থাকবে। অবশ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য চ্যালেঞ্জহীন অবস্থায় থাকবে না। বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মের কারণেই তা ঘটবে।

যেহেতু এ গ্রন্থে অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের ইতিহাস (History of Economic Thought) রচনা আমার লক্ষ্য নয় (যদিও বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ এবং এ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে "সহজিয়া কথা" বলেছি) – আমার লক্ষ্য ঐ দর্শনের অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু অনুসন্ধান করে অন্তঃস্থিত চিন্তা-ভাবনায় 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গ উত্থাপন করা, সেহেতু এ লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা দর্শনের যতটুকু প্রয়োজন আমি ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব (কারণ এ গ্রন্থটি আমি প্রধানত অর্থনীতিবিদদের জন্য রচনা করিনি)। এ কাজটিও দুরূহ বটে (যা তৃতীয় অধ্যায়ে ইতোমধ্যে আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন)। কথাটি বলছি এ জন্য যে, এমনকি অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় গুরুদের অনেকেই তাঁদের পূর্বের এবং সমসাময়িককালের ব্যাপক অর্থনীতি সাহিত্যের অনেক কিছুর সাথেই পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না অথবা তাঁরা এসব আমলে আনেননি। এ প্রসঙ্গে ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড তাঁর অর্থনীতিবিদদের যুগ (The Age of the Economist) গ্রন্থের শেষে 'অধ্যয়ন ইঙ্গিত' অধ্যায়ে বলছেন: "অর্থনীতি সাহিত্য যেমন ব্যাপক, তেমনই জটিল। এমনকি পেশাদার অর্থনীতিবিদদের পক্ষেও এখন আর এর সবটুকুর সাথে পরিচিত থাকা সম্ভব নয়, যদিও এক শতাব্দী আগে কার্ল মার্কসের পক্ষে সারা জীবন পড়াশোনা করার ফলে এই শাস্ত্রের যেখানে যা লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল।"[১০]

অর্থনীতিশাস্ত্রের মূলধারাসমূহের শাস্ত্রীয় দর্শন চিন্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' বিষয়টি অনুধাবনের আগে আমি সুস্পষ্ট কয়েকটি বিষয় বলে রাখা জরুরি বোধ করছি (এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে)। বলা চলে এসবই সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodological) বিষয়। বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

১. অর্থনীতি যেহেতু একটি সামাজিক বিজ্ঞান সেহেতু এর ক্রমবিকাশে মতাদর্শগত বিতর্কটা (ideological debate) স্বাভাবিক। আর মতাদর্শগত বিভিন্ন প্রণালীর অথবা সিস্টেমের পরস্পর সম্পর্কিত সংজ্ঞা, প্রমাণাদি এবং যুক্তিসঙ্গত তত্ত্বমালা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অর্থনীতির অনেক মূল্যবান উপাদান। বলা দরকার যে, অর্থনীতিশাস্ত্র মূল্যবোধ-মুক্ত ('value-free') শাস্ত্র নয়।

২. সামাজিক কর্মপন্থা-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিতর্ক ও দার্শনিক বিতর্ক থেকেই জন্ম নিয়েছে অর্থনীতিশাস্ত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

৩. অর্থনীতিশাস্ত্রের গোঁড়া-কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বীকৃত সিদ্ধান্তসমূহ এখন বিপদের সম্মুখীন।

৪. পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তনশীল বিধায় পৃথিবীর সমস্যাগুলিও পরিবর্তনশীল। আর তাই অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তাদর্শন স্থির কোনো কিছু হতে পারে না; অর্থনীতিশাস্ত্রকে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

৫. স্বীকার করুক বা না করুক আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের অনেকেই কোনো না কোনো ভুলে যাওয়া অর্থনীতিবিদদের অন্ধ ভক্ত।

৬. প্রচলিত অর্থনীতিশাস্ত্র ইতিহাসের সময়কাল বিবেচনায় নিকট অতীত ও দূর অতীতের অনেকের মৌলিক অবদান সম্পর্কে হয় অবগত নয় অথবা অবগত হলেও তা অস্বীকার করে। প্রথমটা সত্য হলে প্রচলিত অর্থশাস্ত্র জ্ঞান-ঘাটতিতে ভুগছে। আর দ্বিতীয়টা সত্য হলে তা হবে স্পষ্টতই সংকীর্ণতা। উভয় ক্ষেত্রে বিষয়টি "জ্ঞান নিয়ে আধিপত্যবাদ" অথবা "জ্ঞান নিয়ে সচেতন কর্তৃত্ববাদ" ('দর্শনের দারিদ্র্য' নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিষয়টি ষষ্ঠ অধ্যায়ে একটু সবিস্তারে উল্লেখ করেছি)।

৭. আধুনিক জগতে অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রভাব অন্য যে কোনো শাস্ত্রের তুলনায় কম নয়।

৮. অর্থনীতির তত্ত্ব আর বাস্তব জগতের সমস্যা আন্তঃসম্পর্কিত বিধায় মানুষ যখনই তার পছন্দের কিছু একটা বেছে নিতে চাইবে, তখনই তাকে অন্য কিছু একটা ছাড় দিতে হবে – এখান থেকেই শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের 'পছন্দ তত্ত্বের' উৎপত্তি (Theory of Choice)। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সৃষ্টি করে বেছে নেয়ার সুযোগ,

[১০] দেখুন, ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড (১৯৯১). অর্থনীতিবিদদের যুগ, পৃ. ২৭১ (বঙ্গানুবাদ, ড. আবদুল্লাহ ফারুক, ঢাকা: বাংলা একাডেমি)। উল্লেখ্য যে কার্ল মার্কস তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছর অর্থাৎ ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত ঐ সময় নাগাদ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্যকর্মসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যা কিছু রচিত হয়েছিল তার পুরোটাই পড়েছিলেন এবং আত্মস্থ করেছিলেন।

আর পছন্দ করার সুযোগের সাথে জড়িত রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থা সেহেতু অর্থনীতিবিদদের দাম থাকবে (মূল্য নয়) অনেক দিন।

৯. যে কোনো তত্ত্বের কাজ ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যকে নিয়মবদ্ধ করা আর সমস্যার সমাধান হতে হবে বাস্তবভিত্তিক এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ভাবনার সাথে তা এমন সাযুজ্যপূর্ণ হতে হবে যা থেকে যুক্তিসঙ্গত ফল পাওয়া যায়। আর এসবের পাশাপাশি সমাজের বিবর্তনে যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) বিকাশ অনিবার্য; আর এই অনিবার্যতার মধ্যে ক্রিয়া করে উৎপাদন সম্পর্ক, সেহেতু যে উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির অনিবার্য বিকাশে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সে উৎপাদন সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মেই পাল্টে যাবে।

১০. উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অনিবার্যতা (অথবা একই কথা যাকে অনেকেই প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড বলে থাকেন) এবং তার সাথে উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়াদি প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক বিষয়। এ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র ও সরকারের ভূমিকা নিয়ে কথা হয়। এ বিষয়ে চিন্তার বিস্তৃতি অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বগতভাবেই রাষ্ট্রের-সরকারের ভূমিকা হতে পারে সর্বনিম্ন মাত্রা (অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে 'মিনিমাল স্টেট' – সেনাবাহিনী, সম্পদ মালিকানার সুরক্ষা এবং অবকাঠামো বিনির্মাণ) থেকে সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় (অর্থাৎ বাজারকে গুরুত্ব দেয়া হবে না, সবকিছু কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা করা হবে)। আর এ নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রটা সব সময়ই রাজনৈতিক অর্থনীতি অর্থাৎ পলিটিক্যাল ইকনমি (প্রদর্শ ৫ দেখুন)। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতোই অর্থনীতিশাস্ত্রের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যে ভাষা ধারণা সংজ্ঞায়িত করে, অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সূত্র বিনির্মাণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ বিধি (general law) প্রতিষ্ঠা করে। এসবও পরিবর্তনশীল। অর্থনীতিশাস্ত্র এসব পরিবর্তন অনুধাবনে এখন পর্যন্ত খুব বেশি এগুতে পারেনি; বিধায় সম্পূর্ণ শাস্ত্রটাই বলা চলে এখন দিশেহারা অবস্থায় নিপতিত – এখান থেকে জন্ম নেবে আগামী দিনের অর্থশাস্ত্র।

প্রদর্শ ৫: অর্থনীতিশাস্ত্র আসলে রাজনৈতিক অর্থনীতি

উদ্ভব সূত্রেই অর্থনীতিশাস্ত্রের (Economics) নামকরণ ছিল রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) । যে কারণে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রধান অর্থনীতিবিদদের মূল গ্রন্থসমূহের শিরোনামে হয় সরাসরি 'রাজনীতি' না হয় 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' প্রত্যয় সংযুক্ত ছিল। যেমন ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ স্যার উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭)-র উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "Treatise of Taxes and Contributions" (১৬৬২ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাসহ মূল্যের শ্রমতত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে), "The Political Anatomy of Ireland" (১৬৭২-এ রচিত এবং ১৬৯১-এ প্রকাশিত) এবং "Political Arithmetic" (১৬৬৪-এ রচিত ১৬৯০-এ প্রকাশিত)। ফরাসি চিকিৎসক ও ফিজিওক্রাট ধারার অন্যতম প্রবক্তা ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪)-র গ্রন্থের নাম "Tableu economique" (প্রকাশকাল ১৭৫৮)। স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট (১৭১৩-১৭৮৯)-এর ধ্রুপদী গ্রন্থের শিরোনাম "An Inquiry into Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৭৬৭)। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক স্কটিশ অর্থনীতিবিদ ও নীতি-শাস্ত্রীয় দার্শনিক এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)-এর গ্রন্থের শিরোনাম "An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations" (১৭৭৬) যা সাধারণ্যে "The Wealth of Nations" নামে খ্যাত। ফরাসি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই (১৭৬৭-১৮৩২)-এর গ্রন্থের শিরোনাম "A Treatise on Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮০৩)। ব্রিটিশ ধর্মযাজক এবং একই সাথে অর্থনীতি ও জনমিতি শাস্ত্রের পণ্ডিত থমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)-এর গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "A Treatise on Political Economy"; ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)-র গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "Principles of Political Economy and Taxation" (প্রকাশকাল ১৮১৭); সুইজারল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ লিওনার্দ সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২) যিনি নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজিবাদের বিপদ সম্পর্কে তত্ত্ব হাজির করেছিলেন – তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম "New Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮১৯)। ব্রিটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) যিনি উপযোগিতাবাদের তত্ত্ব বিনির্মাণ করেছিলেন – তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম ছিল "Principles of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৪৮)। আর জার্মান দার্শনিক-অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সমালোচক (যে নামে ডাকাটা তিনি শ্রেয় মনে করতেন) কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থদ্বয়ের নাম "A Contribution to the Critique of Political Economy" (প্রকাশকাল ১৮৫৯) এবং "Das Capital: Critique of Political Economy" (প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৮৬৭ সাল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত

হয় মার্কসের মৃত্যুর পর যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে)। অর্থনীতিশাস্ত্রের মৌলিকতম উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ শুধু শিরোনামগতভাবেই নয় অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর নিরিখে সুস্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতি। বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সমাজতন্ত্রের আগমন আর পুঁজিবাদের বৈশ্বিক সংকটকাল থেকে রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্র থেকে "রাজনীতি' প্রত্যয়টি বাদ দিয়ে এবং শাস্ত্রের অনুসন্ধান ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে তা শুধু "অর্থনীতিশাস্ত্র" অথবা "অর্থনীতি" নামাঙ্কিত করা হয়।

উৎস: সংশ্লিষ্ট দর্শনশাস্ত্রীয় বিষয়াদিসহ অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

১১। জীবনের সমস্যাগুলো সবসময়ই জটিল ছিল – এ ক্ষেত্রে সরলীকরণ হবে আত্মঘাতী; অতীতের মানুষেরা আমাদের মতোই বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ছিলেন; "*আমাদের তত্ত্ব তাদের চেয়ে ভাল*" – একথা শুধু বিতর্কিতই নয় তা হতে পারে জ্ঞানজগতে পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

এখন আসা যাক মূলধারার অর্থনীতিশাস্ত্রের মর্মকথায় এবং সংশ্লিষ্ট 'দর্শনের দারিদ্র্য' ইঙ্গিতবহ প্রসঙ্গসমূহে। উল্লেখ্য যে অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের সারবত্তা (essence) অনুসন্ধানে ঐতিহাসিক সময়কালের নিরিখে যে বিষয়সমূহের বিকাশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব অনুধাবন করতে হবে সেগুলি হলো: সম্পদের উৎসকেন্দ্রিক (কে সম্পদ সৃষ্টি করে, কোথায় সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং কীভাবে সম্পদ বাড়ানো যায়), উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানার ধরন-স্বরূপকেন্দ্রিক, উৎপাদিত দ্রব্যের সরল বিনিময় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারকেন্দ্রিক,[১১] উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন-বিনিময়-বণ্টন-ভোগ সংশ্লিষ্ট সমীকরণকেন্দ্রিক, উৎপাদনের উপাদান-উপকরণ (factors of production) কেন্দ্রিক, শ্রম বিভাজনকেন্দ্রিক, উৎপাদনে বাজার-রাষ্ট্র-সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণকেন্দ্রিক, সামূহিক প্রাকৃতিক প্রণালীর বা সিস্টেমের সাথে আন্তঃসম্পর্ককেন্দ্রিক প্রভৃতি।

'অর্থনীতিশাস্ত্র' বললেই প্রায় সবাই এখন "বাজার অর্থনীতি" অথবা 'বাজার' বোঝেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের আগে আধুনিক বাজার অর্থনীতি বলতে তেমন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। যা ছিল তা কোনো অর্থেই আধুনিক পণ্য প্রথা নয় – ছিল বড়জোর সরল পণ্য উৎপাদন (simple commodity production), যার মধ্যে শোষণ প্রক্রিয়া বলে কিছু ছিল না। সরল পণ্য উৎপাদনের শুরুটা তখন থেকে, যখন থেকে শ্রম বিভাজনের (division of labor) শুরু। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম সাম্যবাদী অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজনের কোনো একপর্যায়ে একটি জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য (পণ্য নয়) অন্য এক গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে কেনা-বেচা হতো না – হস্তান্তরিত হতো (বলা চলে বিনিময় হতো), আর একই গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য ঐ গোষ্ঠীর সবার মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেত। এ ধরণের গোষ্ঠী-অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়ের (means of production) উপর মালিকানা ছিল যৌথ অথবা সর্বজনীন (collective, universal, communal)। এ প্রক্রিয়ায়, বিকাশের এক পর্বে, যখন থেকে শ্রম বিভাজনের সাথে সাথে উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটল, ঠিক তখন থেকেই আসলে বাজারের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন প্রথার শুরু। তাহলে এককথায় যা দাঁড়াল তা এ রকম: উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানাই পণ্য উৎপাদনের মূল ভিত্তি। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) বলছেন, "সম্পত্তির উপর অধিকার (ব্যক্তিগত মালিকানা) কোনো প্রাকৃতিক অধিকার নয়।"

সরল পণ্য উৎপাদন প্রথাটি দাস যুগের অর্থনীতি ও পরবর্তী সামন্তবাদী অর্থনীতির প্রাথমিক পর্বের জন্যও প্রযোজ্য (প্রাথমিক পর্ব বলা হচ্ছে এ জন্য যে সামন্তবাদই বিকাশের একপর্যায়ে পুঁজিবাদে উত্তরিত হয়)। এ দুই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শুরুটাই ছিল কৃষক ও কারিগরদের ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদনের আকারে, যেখানে উৎপাদক নিজেই উৎপাদনের উপায়সমূহের (যেমন জমি, ছোটখাটো যন্ত্রপাতি) মালিক। আর সে কারণেই উৎপাদক নিজেই নিজের উৎপন্ন দ্রব্যেরও

[১১] বিষয়টি উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় (exchange of products) এবং উৎপাদিত দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তর (transformation of product into commodity) সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য সব দ্রব্যই পণ্য নয়, তবে সব পণ্যই দ্রব্য (all products are not commodities but all commodities are products)। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হলেই তা হয় পণ্য। আর তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে মানবসমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 'দ্রব্যের' (product) ইতিহাস 'পণ্যের' (commodities) ইতিহাসের চেয়ে পুরাতন। আবার উৎপাদিত দ্রব্য যখন পণ্য নয়, তখন দ্রব্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য শোষণ নয়, নেহায়েতই বিনিময়– ব্যবহারিক মূল্যের বিনিময়। আর দ্রব্য যখন বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়, তখন পণ্য বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য 'শোষণ'। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিময়ের এ বিষয়টি যে সহজ সমীকরণে প্রকাশ করা যেতে পারে তা হলো প্রথম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য নয়): "পণ্য→টাকা→পণ্য" অর্থাৎ নিজের শ্রমজাত পণ্য অন্যের শ্রমজাত পণ্যের সাথে বিনিময় (এখানে অর্থ পুঁজি না); আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দ্রব্য যখন পণ্য হয়): "টাকা→পণ্য→ বেশি টাকা" অর্থাৎ এখানে মূল্য আত্মপ্রসারণশীল, টাকা পণ্য ক্রয় করে আরো বেশি টাকা বানাচ্ছে, এটাই মূলধন, যা শোষণ উদ্ভূত। সমীকরণের প্রথম 'টাকা' (অর্থাৎ 'অর্থ') বিনিয়োগ হচ্ছে, অর্থাৎ বাজারে যাচ্ছে এবং বাজারে গিয়ে কিনছে 'শ্রম' অথবা 'শ্রম উদ্ভূত কোনো পণ্য' (যেমন, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ইত্যাদি)। এ পণ্য উৎপাদন প্রথার ভিত্তিমূলে আছে দুটি বিষয়: (১) শ্রম বিভাজন ও (২) শ্রমের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব। আর এই পণ্যই হলো পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কোষ (economic cell form of capitalism)– এর সৃষ্টি ঠিক তখন থেকেই, যখন থেকে শ্রমশক্তিও (labour power) পণ্যে পরিণত হয়েছে – বাজারে বেচা কেনার পণ্যে।

মালিক। অর্থাৎ এ ধরনের অর্থনীতি ব্যবস্থায় নিজের শ্রমের ফল উৎপাদক নিজেই ভোগ করতে পারে। তাই সরল পণ্য উৎপাদনের ঐ পদ্ধতিতে শোষণ বলতে কিছু নেই। বাজারভিত্তিক পণ্য উৎপাদন প্রথায় শোষণের শুরুটা ঠিক তখন থেকে, যখন সরল পণ্য উৎপাদনের রূপান্তর ঘটল পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদন প্রথায়। আর প্রথাটি এমন যেখানে মানুষের শ্রমই হয়ে গেল বাজারে কেনা-বেচার পণ্য, যেখানে পণ্য উৎপাদন হয়ে গেল সর্বজনীন ও নিয়ামক (universal and dominant system of production of commodities)।

সরল পণ্য উৎপাদনে যেখানে উৎপাদনের উপায়ের মালিক উৎপাদক নিজেই এবং অর্থনীতি পরিচালিত হতো মালিক-উৎপাদকের শ্রমের ভিত্তিতে সেখানে রূপান্তরিত পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনের ভিত্তি হলো মালিক কর্তৃক শ্রমিক শোষণ। আর শেষের এটা হলো শ্রমদাতার উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল-ফসল মালিক কর্তৃক আত্মসাৎ করা। সুতরাং পণ্য উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট বাজার প্রথা ইতিহাসজাত বিষয়, মানবসমাজের বিবর্তনের উত্তরণকালীন বিষয়, কোনো অর্থেই মানুষের স্বভাবজাত বিষয় নয়, এবং তা সনাতনও নয়, শাশ্বতও নয়। এখানেই ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের গুরু এডাম স্মিথ বড় ভুল করে ফেলেছেন যখন বলছেন, "পণ্য প্রথা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, এটা তার স্বভাবজাত।" আর তাই অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনের শুরুটাই 'দর্শনের দারিদ্র্য' দিয়ে – এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রকৃতপক্ষে পণ্যপ্রথা তথা বাজার ব্যবস্থার শুরু ইতিহাসের এক কালাংশে, যা আরেক কালাংশে অবলুপ্ত হতে বাধ্য। তারপরেও মানুষ থাকবে, উৎপাদন হবে, শ্রম বিভাজন উত্তরোত্তর বিকশিত হতে থাকবে, উৎপাদনের উপায় ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ শ্রম-হাতিয়ার বিকশিত হতে থাকবে। এটাই প্রকৃতির বিধান। এটা গতির সূত্র। এ গতির শেষ বলে কিছু নেই।

বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ যে বাজারের মাধ্যমে পণ্যের দাম, উৎপাদনের পরিমাণ আর প্রত্যেকের আয়-উপার্জন নির্ধারিত হচ্ছে এমন এক পদ্ধতিতে যেখানে ব্যক্তিবিশেষের একক প্রভাব নেই, ব্যাপক অর্থের এ ব্যবস্থার উদ্ভব দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগের শেষে মাত্র পঞ্চদশ শতকের শুরুতে। এর আগের অবস্থার বিশ্লেষণ, যা ইতোমধ্যে করেছি, তার বাস্তব রূপটি ছিল এমন যে ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষই এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস করত যার সামাজিক ভিত্তিটাই ছিল এমন যেখানে অর্জনপ্রবণ-মুনাফাকেন্দ্রিক-ক্রয়বিক্রয়প্রধান অর্থনীতির বদলে প্রত্যেক মানুষের জন্য ছিল কতগুলো অধিকার আর প্রতিদানে ছিল কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন। এ পরিবর্তন-রূপান্তরটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম যার নজরে এলো তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক যাঁর নাম টমাস বেকন (১৫১২-১৬৬৭)। টমাস বেকন ঐ যুগের জড়বাদকে তিরস্কার করে বললেন, "যেসব ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুসন্ধানে লিপ্ত তারা হলেন লোভী, মেষপালক আর রাখাল স্বভাবের ভদ্রলোক।"

টমাস বেকনের সমসাময়িক সময়ের অর্থনৈতিক বিকাশক্রমটা ছিল এ রকম: যে কৃষক সমাজ সামন্তপ্রভু জমিদারদের (manor) হাতে তাদের শ্রম ও শ্রমলব্ধ ফসল তুলে দিত (দ্রব্যখাজনা – rent in kind) তারা পরবর্তীকালে ফসল বিক্রি করে নগদ অর্থে খাজনা দেয়া শুরু করল (অর্থাৎ দ্রব্যখাজনার রূপান্তর ঘটল অর্থখাজনায় – rent in cash)। প্রসারিত হতে থাকল বাজার (market)। এ প্রক্রিয়ায় সামন্তপ্রভুদের একাংশ বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হলো যাদের হাতে ক্রমপুঞ্জিভূত হতে থাকল সম্পদ এবং ক্ষমতা; সৃষ্টি হলো দ্বৈত অর্থনীতি – একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লী আর অন্যদিকে বাণিজ্যভিত্তিক নগর; সৃষ্টি হলো নিয়ন্ত্রিত এক অর্থনীতি যেখানে ম্যানর আর গিল্ড ঠিক করত বাজারের লেনদেন, আদান-প্রদানের বিধিবিধান; ঠিক সমসাময়িক সময়েই ভৌগলিক আবিষ্কারসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করল যা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে (ইউরোপে) সোনা ও রূপার আকারে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রবাহ সৃষ্টি করল; জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব আঘাত হানল বংশমর্যাদা ও গীর্জার ক্ষমতায়; নব্য শাসকেরা যুদ্ধের নতুন কলাকৌশল রপ্ত করে প্রতিষ্ঠা করল বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীসহ বিশাল নৌবহর যে জন্য প্রয়োজন পড়ল বিপুল অর্থ ও উন্নত প্রশাসন; এসব চাহিদা মেটাতে সৃষ্টি হলো জাতীয় কর ব্যবস্থা। এসব কিছুর ফলেই সৃষ্টি হলো বাজার ব্যবস্থার নবতর রূপ। আর নয়া অর্থনৈতিক এ ব্যবস্থার ফলে 'অর্থনীতি' নামক একটি শাস্ত্রেরও উদ্ভব ঘটল, যেখানে ধর্মযাজকেরাই ছিলেন 'অর্থনীতিবিদদের' প্রথম দল।

ধর্মযাজকেরাই যেহেতু ছিলেন অর্থনীতিবিদদের প্রথম দল, সেহেতু স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের চিন্তাভাবনার মূল বিষয় ছিল – কীভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে পুনর্গঠন করা যায়? অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রথম দল এসব ধর্মযাজকেরা বলতে থাকলেন, পৃথিবীর জীবনটা পরলৌকিক চিরস্থায়ী জীবনের প্রারম্ভিকা মাত্র; আর মানুষের সব উদ্যোগ-আচরণেই নৈতিকতার বিধিবিধানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া উচিত। তাঁরা বললেন, মোক্ষপ্রাপ্তিই জীবনের মূল কাজ। তাঁরা এও বললেন যে অর্থের কারণেই অর্থ কামনা করাটা পাপ। কিন্তু গোড়া ধর্মযাজকদের এসব কথা মুনাফাভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সাথে

ক্রমান্বয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। ধাঁধায় পড়ল মানুষ, আর জন্মসূত্রেই ধাঁধায় পড়ল অর্থনীতিশাস্ত্র (সঠিকভাবে বললে বলতে হয় "রাজনৈতিক অর্থনীতি" শাস্ত্র)। একদিকে ধর্মের নীতিশাস্ত্রীয় শিক্ষা হলো এই যে প্রত্যেকেই নৈতিক দিকে থেকে একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ অর্থাৎ 'ভ্রাতৃভাব', আর অন্যদিকে বাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য একে অপরকে টেক্কা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা, একে অপরকে পিছনে ফেলার প্রচেষ্টা অর্থাৎ 'প্রতিযোগিতা' (competition)। মোক্ষলাভ ও পার্থিব সাফল্যের নৈতিক এ দ্বন্দ্ব থেকে উৎপত্তি ষোড়শ শতকের ইউরোপে পোপ-বিরোধী খ্রিষ্টীয় ধর্মবিপ্লব বা রিফরমেশন। এদের যুক্তি: "মোক্ষলাভ হবে নিজের পেশায় কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে, পেশা যেটাই হোক না কেন। পেশা ঈশ্বর প্রদত্ত।" তাঁদের মূল বক্তব্য হলো এ রকম, "ব্যবসায়ীরা ঈশ্বর সৃষ্ট, এবং তারা ঈশ্বরেরই সৃষ্ট মানুষের সাথে ঈশ্বরের মধ্যস্থতাকারী মাত্র।" আর এ বক্তব্য দিয়ে তাঁরা এমন ধরনের অর্থনৈতিক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন, যা মুনাফাভিত্তিক বাজার অর্থনীতিকে নৈতিক সমর্থন যোগাল। নব্য অর্থনৈতিক এই নীতিশাস্ত্র একদিকে বলেছে, মানুষের উচিত অপর মানুষের সম্পর্কে কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া; আর অন্যদিকে বলেছে, বাজার অর্থনীতির "খদ্দের সাবধান" নীতির আওতায় প্রতিযোগিতার আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হবে। এসব বলে তাঁরা নতুন এক নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেন। আমার ধারণা এখান থেকেই অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' বাড়তে থাকল।

আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কেন্টাইলিস্ট (mercantilist) বা বণিকতন্ত্রী বা বাণিজ্যবাদীরাই ছিল প্রথম মূলধারা। ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকে গড়ে ওঠা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের (Nation States) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি আর সেই সাথে অষ্টাদশ শতকের বিতর্ক – চূড়ান্ত বিবেচনায় জাতীয় সম্পদের (national wealth) উৎস কী? এসবই ছিল তাঁদের চিন্তাভাবনার মূল বিষয়াদি। জাতীয় সম্পদের উৎস-সংশ্লিষ্ট বিতর্কে তখন কেউ মনে করতেন উৎসটা হলো ব্যবসা, কেউ বলতেন কৃষি এবং প্রকৃতি, আবারো কেউ মনে করতেন মানুষের শ্রম। বিতর্কটা গুরুত্ববহ ছিল এ কারণে যে এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করত সরকারের বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নীতি (economic policy) নির্ধারণ। অভ্যন্তরীণ সমস্যাটি ছিল প্রধানত মধ্যযুগের স্থানীয়ভিত্তিক সমাজ থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা-সংশ্লিষ্ট। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর নিহিতার্থ হলো সারা দেশের জন্য একক মুদ্রা ব্যবস্থা, একক ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি, সারা দেশে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন টোল-শুল্কের বিপরীতে একক কর ও শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের সাথে জাতীয় শাসক রাজ-রাজড়াদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল অনিবার্য। আর এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন ছিল স্ব-স্ব পক্ষীয় মিত্রবাহিনী। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'ধারার অর্থনীতিবিদ। এদের মধ্যে ঐক্যকামী জাতীয় শাসক – রাজ-রাজড়াদের পক্ষটাই ছিল পাল্লায় ভারী। আর পাল্লা ভারি করতেই মার্কেনটাইলিস্টদের উদ্ভব। রাজ-রাজড়ারা জাতি-রাষ্ট্র গঠনে মিত্র হিসেবে যাদের পেলেন তারা হলেন নগরের উদীয়মান বণিকশ্রেণি, ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণি, উকিল শ্রেণি এবং সরকারি আমলা ও কোর্ট। এ মৈত্রী ছিল সমস্বার্থের ঐক্য। কারণ, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বণিক সম্প্রদায়ের কাজ – যে বণিকেরা রাজার সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক; ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণি রাজার মধ্যে দেখতে পেল স্থানীয় জমিদার-ব্যারনদের শক্তি কাবু করার পথ; নতুন নতুন জটিল শর্তাবলি জুড়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে প্রয়োজন ছিল উকিলদের; আর সরকারি আমলা-প্রশাসন ও কোর্ট ছিল এসবের কৌশলগত অংশীদার 'ভদ্রলোক শ্রেণি'। সুতরাং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনেই রাজশক্তি, বণিকশক্তি, ভদ্রলোক আর বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। তা অনিবার্য ছিল সমগ্রজাতিকে একজন শক্তিমান শাসকের অধীনে একত্রিত করার স্বার্থে। আর এসব কারণেই প্রয়োজন দেখা দিল শক্তিশালী সামরিক ও নৌশক্তির এবং একই সাথে উৎপাদন ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার অর্থনৈতিক নীতিমালা। এসব বাস্তবায়নের পক্ষে যারা যুক্তি-তর্ক হাজির করলেন তারাই আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রথম সংঘবদ্ধ চিন্তাবিদ।

এখানে মার্কেনটাইলিস্টদের মধ্যে প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ হিসেবে সমসাময়িককালে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে আছেন ব্রিটেনের থমাস মান, জেরার্ড দ্য মলিনেস, এডওয়ার্ড মিথেলডেন; ইতালির এন্থোনিও সেররা; ফ্রান্সের জ্যঁ বাতিস্ত কোলবার্ট (প্রদর্শ ৬-এ সংক্ষেপে জীবনী দেখা যেতে পারে)। মার্কেনটাইলিস্টরাই প্রথম বললেন, জাতিসমূহের সম্পদের উৎস হলো 'বাণিজ্য' – কৃষি, শিল্প, বা শ্রম নয়। সুতরাং বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে অন্যের দেশ দখল করা অনৈতিক নয় বলে তাঁরা রাজাদের ফর্দ দিলেন: "যুদ্ধ ভাল, যদি যুদ্ধে জেতা যায়"; তাঁরাই বললেন, (ড্যানিয়েল ডিফোর থেকে ধার করে) বৈদেশিক বাণিজ্য উৎসাহিত করতে "উপনিবেশ" (কলোনি) সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা; বাণিজ্য সম্প্রসারণে তারা সরকার কর্তৃক বণিকদের সব ধরনের প্রণোদনার কথা বললেন; তাঁরা বললেন অর্থই হলো সম্পদ, আর সোনা-রুপা সঞ্চয় (মজুদ) করাটাই উন্নয়নের চাবিকাঠি; তাঁরা বললেন এক জাতির লাভ অন্য জাতির জন্য ক্ষতি; তাঁরাই ফর্দ দিলেন নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionism) গ্রহণের পক্ষে; মজুরি কম রাখার পরামর্শ দিলেন; স্ব-বাণিজ্যিক স্বার্থ উৎসাহিত করতে এবং রপ্তানি উদ্বৃত্ত রক্ষা করতে তাঁরা পরামর্শ দিলেন সংরক্ষণমূলক শুল্কব্যবস্থা ও

নেভিগেশন আইন প্রণয়নের; মুদ্রা-বিষয়ক নীতি (money policy)-তে তাঁরা চাইলেন 'সহজ মুদ্রা নীতি' (easy money policy) অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ যথেষ্ট থাকবে যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য উৎসাহিত হয় এবং সুদের হার কম থাকে; মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বললেন সঙ্গত কারণেই এবং সেই সাথে যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন বাণিজ্যিক ভারসাম্য দেশের অনুকূলে রাখতে হবে – এই ছিল মার্কেন্টাইলিস্টদের মৌলিক মতবাদ।

প্রদর্শ ৬: এন্থোনিও সেররা, থমাস মান, জেরার্ড মালিনেস, এডয়ার্ড মিথেলডেন, জ্যঁ বাতিস্ত কোলবার্ট

এন্থোনিও সেররা (১৫৭০-?): ইতালিয়ান দার্শনিক এবং বাণিজ্যবাদী অর্থনীতিচিন্তার পথিকৃৎ। অর্থশাস্ত্রের প্রথম ব্যক্তি যিনি বাণিজ্যের ভারসাম্য ধারণার ব্যাখ্যা করেছেন। মুদ্রার ঘাটতি দূর করতে রপ্তানি বাণিজ্য উৎসাহিত করার কথা বলেছেন।

থমাস মান (১৫৭১-১৬৪১): ব্রিটেনে শুরুর দিকের বাণিজ্যবাদী অর্থনীতিবিদদের অন্যতম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক। ইংল্যান্ডকে আরো সম্পদশালী করার পথ হিসেবে বাণিজ্যের ধনাত্মক ভারসাম্য রক্ষার পথ-পদ্ধতি বাতলেছেন।

জেরার্ড দ্য মালিনেস্ (১৫৮৬-১৬৪১): ব্যক্তিগত জীবনে বণিক এবং ব্রিটিশ বাণিজ্য কমিশনার। তিনি মনে করতেন যেহেতু দেশের প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে মূল্যবান ধাতুর (সোনা ও রুপা) সঞ্চয়ের উপর সেহেতু আমদানির উপর উচ্চহারে কর বসাতে হবে আর সোনা-রুপার রপ্তানি বন্ধ করতে হবে।

এডওয়ার্ড মিথেলডেন (১৬০৮-১৬৫৪): ব্রিটিশ বণিক এবং প্রাগ্রসর বাণিজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ। যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে মুদ্রার আন্তর্জাতিক চলাচল এবং মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা ব্যাংকারদের কারসাজির উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহের উপর।

জ্যঁ বাতিস্ত কোলবার্ট (১৬১৯-১৬৮৩): ফরাসি রাজনীতিবিদ, অর্থমন্ত্রী। বাণিজ্যবাদের অন্যতম হিসেবে যেসব বিষয়ে সংস্কার করে দেখিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্য, উপনিবেশ বৃদ্ধি, দেশের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি, আমদানি অনুৎসাহিত করার লক্ষ্যে উচ্চ শুল্কহার আরোপ, ফরাসি মার্চেন্ট নৌশক্তি শক্তিশালী করা।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

অর্থনীতিশাস্ত্রে মার্কেন্টাইলিস্টদের উল্লিখিত চিন্তাধারার প্রতিটি উপাদানই ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে জাতিরাষ্ট্র গঠনে ঐক্য সৃষ্টিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চরম বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত। অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় বিজ্ঞান আর মতবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকেই মার্কেন্টাইলইজম ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু শাস্ত্রীয় দর্শন হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনকে যেভাবে স্থানিক রূপ দিয়েছে তা নীতি-নৈতিকতার নিরিখে তাদের 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

মার্কেন্টাইলিজমের আগ্রাসী সংরক্ষণবাদী নীতি অবলম্বন করেই ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশ সমসাময়িককালে উন্নতি করেছে। অথচ আজকের যুগে ঐ ইংল্যান্ড-ফ্রান্সসহ ইউরোপের প্রায় সব শক্তি আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বকে অথবা উন্নয়নকামী বিশ্বকে বলছে "যাই করো সংরক্ষণবাদী নীতি গ্রহণ করতে পারবে না", বলছে "উদার হও, অর্থনীতিকে উদারীকৃত কর"। এ শুধু মার্কেন্টাইলইজমের অন্তঃস্থিত দারিদ্র্য নয়, এ এক বিষম স্ববিরোধ!

মার্কেন্টাইলইজম যখন বাজার অর্থনীতির কিছু কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষতি করতে লাগল, তখনই হলো প্রতিবাদ। আর এ প্রতিবাদ থেকেই জন্ম নিল অর্থশাস্ত্রের নতুন মতবাদ। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের অন্যতম হলো কৃষক, শিল্প উৎপাদক ও ছোট ব্যবসায়ী (বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ)। কৃষকেরা দেখলেন রাজপুরুষেরা করমুক্ত কিন্তু যাবতীয় কর আদায় করা হচ্ছে খুদে কৃষক আর স্বনির্ভর কৃষিজীবীদের থেকে; শিল্প উৎপাদনকারীরা দেখলেন যে যা কিছু সুবিধে সবই যাচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারণ-সম্প্রসারণে; সাধারণ জনগণ দেখলেন সরকার দুর্নীতিপরায়ণ-অযোগ্য; আর উপনিবেশের মানুষ দেখলেন যে সৈন্যদল ইংরেজ-ফরাসি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণে হেন অন্যায় নেই যা করছে না; অথচ "অজ্ঞাত কারণে" তাদেরই পুষতে হচ্ছে আমাদের। এসব কারণেই মার্কেন্টাইলইজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আস্তে আস্তে প্রতিরোধের শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে ক্ষুদ্র কৃষকেরা সরকার আরোপিত কর-শুল্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল; ইংরেজদের মার্কিন উপনিবেশে "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ট্যাক্স না দেয়ার দাবি" উঠল; ভারতে-উপনিবেশ বিরোধী শক্তি দানা বাঁধতে থাকল; আমেরিকায় শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী আমেরিকান বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল; এমনকি ইউরোপেও অর্থনৈতিক প্রশ্নে বিতর্ক জোরদার হলো। শেষ পর্যন্ত মার্কেন্টাইলইজমের যুগের পরিণতি এমনই খারাপ হলো যখন ভ্যাঁসো দ্য গুরনে

(১৭১২-১৭৫৯) নামক সরকারের একজন ট্রেডমার্ক ইনসপেক্টর মার্কেন্টাইল নিয়ন্ত্রণ বিধির বিরুদ্ধে মোহভঙ্গ হয়ে বললেন 'লেজে ফেরে', 'লেজে পাসে' (*laissez faire, laissez passer*) অর্থাৎ 'মুক্ত কর্ম প্রচেষ্টা', 'মুক্ত বাণিজ্য'। অবশ্য এ হলো মোহভঙ্গ বাণী। এ বাণীও পরবর্তীকালে দেখা যাবে একদিকে যেমন মুক্তির বাণী নয়, অন্যদিকে এ বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্ত করতে আদৌ সক্ষম হয়নি।

ফ্রান্সে মার্কেন্টাইলইজমের বিরোধীরা "ফিজিওক্রাট" (Physiocrat অর্থাৎ "প্রকৃতির সরকার" বা "Government of Nature") নামে পরিচিত। অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশে ফিজিওক্রাটদের অবস্থান অন্য অনেকের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (Francois Quesney, ১৬৯৪-১৭৭৪) পেশায় চিকিৎসক এবং রাজা পঞ্চদশ লুই-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক (প্রদর্শ ৭ দেখুন)। তিনি ফরাসি দেশে কৃষকদের ১৫০-২০০ বছরের স্থবিরতার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, সম্পদের উৎস – শিল্প বা বাণিজ্য নয়, সম্পদের উৎস কৃষি। তাঁর মতটি এ রকম: প্রকৃতির জীবনদানকারী সামগ্রী হিসাবে একমাত্র কৃষিই উৎপাদনে নিয়োজিত মানব প্রচেষ্টার ফলে উদ্বৃত্ত (surplus) সৃষ্টি করতে সক্ষম। অর্থনীতিতে উৎপাদন-পুনরুৎপাদন সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে চিকিৎসাশাস্ত্রের নব-আবিষ্কার মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার (blood circulation in human body) নিরিখে দেখে তিনি ১৭৫৮ সালে আবিষ্কার করলেন 'ইকনমিক টেবিল' (Tableũ Economique)। যা অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক টেবিল" অথবা প্রথম "ম্যাক্রোইকনমিক মডেল" নামে স্বীকৃত। যেখানে তিনি দেখালেন, কীভাবে কৃষি থেকে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে খাজনা (rent), মজুরি এবং বেচাকেনার মাধ্যমে তার গতিপথে সব শ্রেণির মানুষেরই ভরণপোষণ জোগায়। চিকিৎসক-অর্থনীতিবিদ ফ্রাঁসোয়া কেনে্র বিশ্লেষণ ভূস্বামীভিত্তিক রাজতন্ত্রের জন্য চরম আঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াল যখন তিনি বললেন যে প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণি – কৃষককুলের স্থবিরতার মূলে আছে ভূস্বামী-জমিদার, যারা প্রকৃত অর্থে পরজীবী (Parasite)। আর তাই ফ্রান্সের উন্নতি চাইলে মধ্যস্বত্বভোগীসহ পরজীবী ভূস্বামীদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করতে হবে (কৃষকের উপর নয়), কারণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টিকারী কৃষকদের উদ্বৃত্ত ঐ ভূস্বামীরা বিলাস জীবন যাপনে ব্যয় করে আয়ের উৎপাদনশীল চলাচল ব্যাহত করছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানসম্রাট ফ্রাঁসোয়া কেনে্ এসব বলে শেষমেশ চাকরি হারালেন। কেনের পাশাপাশি জ্যাকস তুরগো (১৭২৭-১৭৮১) ছিলেন আরেকজন ফিজিওক্রাট যিনি অর্থমন্ত্রী হয়ে রাজার সমর্থনে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং মার্কেন্টাইলিজম-বিরোধী সংস্কার কার্যক্রমে হাত দেন (প্রদর্শ ৭ দেখুন)। শেষ পর্যন্ত তিনিও সম্ভ্রান্ত সামন্তদের বিরোধিতার মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন। আর এর কয়েক বছর পরেই আবার ঐ সরকারকেও দূর করে দেয়া হয়।

প্রদর্শ ৭: ফ্রাঁসোয়া কেনে্, জ্যাকস তুরগো

ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪): ফরাসি চিকিৎসক ও অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিশাস্ত্রের 'ফিজিওক্রাট' ধারার মূল প্রবক্তা। 'ফিজিওক্রাট' এর অর্থ 'প্রকৃতির শক্তি'। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অর্থনৈতিক মডেল "টেবলু ইকনমিক"এর আবিষ্কর্তা। এ ছাড়াও মুক্তবাজার-মুক্তকর্মপ্রচেষ্টা নীতি-প্রস্তাব, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও তার বণ্টন, এবং বিভিন্ন অংশের একীভূত সত্তা হিসেবে সমগ্রক অর্থনীতি – এসব বিষয়ে মৌলিক চিন্তাবিদ।

জ্যাকস তুরগো (১৭২৭-১৭৮১): আন্নে রবার্ট জ্যাকস তুরগো ছিলেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়ক। যদিও মূলত ফিজিওক্রাট কিন্তু এখন তাঁকে অর্থনৈতিক উদারবাদী হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা হয়ে থাকে তিনিই প্রথম কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক প্রাপ্তির সূত্রের (Law of diminishing marginal return) আবিষ্কর্তা।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

ফ্রাঁসোয়া কেনে্, জ্যাকস তুরগোসহ ফিজিওক্রাটদের সবাই একটি মৌলিক প্রশ্নে একমত হন যে সব সম্পদই শেষ পর্যন্ত জমি ও কৃষি থেকে আসে। শিল্প শুধু প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদের আকার বা রূপ পরিবর্তন করতে পারে আর বাণিজ্য পারে শুধু তার অবস্থান ও মালিকানা পরিবর্তন করতে। একমাত্র জমিই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে এবং এটা ছিল সম্পদের উৎস সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব। ফিজিওক্রাটদের এ তত্ত্বের প্রধান ভ্রান্তি যেখানে তা হলো উৎপাদনশীল শ্রমক্ষেত্র কৃষি এবং শিল্প উভয় খাতেই যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় এবং সে উদ্বৃত্ত বণ্টিত হয় মালিক শ্রেণির মধ্যে – এ সত্যকে দেখতে না পারা। সম্ভবত এটিই ছিল অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্যতম মূলধারা ফিজিওক্রাটদের চিন্তা-ভাবনার প্রধান সীমাবদ্ধতা। আর এ সীমাবদ্ধতা থেকেই উদ্ভূত ফিজিওক্রাটদের 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

অর্থনীতিশাস্ত্রে ফিজিওক্রাটদের প্রভাব টিকে ছিল বহুদিন। কিন্তু তাদের যুগটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ফিজিওক্রাটদের পাশাপাশি মোটামুটি একই সময়ে আবির্ভূত হয় অর্থনীতিশাস্ত্রের উদারপন্থী (Liberalism) দল। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং

অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে হাঁটি হাঁটি পা করে ঊনবিংশ শতকে এই মতবাদটা হয়ে দাঁড়াল অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা-জগতের প্রধান স্রোতধারা, যা আজও চিরায়ত বা ধ্রুপদী (চিরায়ত) বা ক্লাসিক্যাল রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy) হিসেবে পরিচিত (ছক ১-এর প্রথম স্কুল)।

এখানে বলে রাখি যে অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রচলিত সাহিত্যে ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রকে "অর্থনৈতিক উদারবাদ" (Economic Liberalism) বলা হয়ে থাকে। তবে কেন যে অনুদারকে উদার বলে সহানুভূতি নেয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়। প্রসঙ্গটি যেহেতু প্রশ্নাতীত নয় তাই একটু বলা দরকার। দর্শন-সাহিত্যে উদারবাদ (Leberalism in Philosophy) বলতে সেই দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝানো হয় যা মুক্তি (liberty) ও সাম্য-সমতা (equality)-র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি-সাহিত্যে উদারবাদ (Leberalism in Politics) বলতে এমন এক ধারণা বোঝানো হয় যার মর্মার্থ হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং মানুষের চয়নের স্বাধীনতা (freedom of choice) – এ দুটো সর্বোচ্চকরণই প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর অর্থনীতি-সাহিত্যে উদারবাদ (Leberalism in Economics) বলতে এমন এক ধারণা নির্দেশ করা হয় যার মর্মার্থ হলো: মূল্য, খাজনা ও মজুরি নিয়ন্ত্রণ সরকারের কাজ হওয়া উচিত নয়; বিপরীতে মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং চাহিদা ও সরবরাহের শক্তির মিথস্ক্রিয়ায় এক ধরনের ভারসাম্য সৃষ্টির সুযোগ দিলে তা অধিকাংশ নাগরিকের জন্য উপকারী বা লাভজনক হবে। বিষয়টি এ রকম: সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে 'পুঁজিবাদ' নামক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিক তত্ত্ব বিনির্মাণ ও প্রচার করেন। এটাই উদারবাদ বলে পরিচিত। একদিকে উঠতি পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় ক্ষয়িষ্ণু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধিতার কারণে 'উদারবাদ' আসলেই অনুদার নয়, বলা চলে যথেষ্ট মাত্রায় উদার। আর অন্যদিকে পুঁজিবাদের বিকাশ ত্বরান্বয়নে 'স্ব-স্বার্থ' (self-interest) অথবা 'ব্যক্তি-স্বার্থ'কে সামাজিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেখাটা আদৌ 'উদার' নয়। এসব কারণেই উদারবাদকে (উদারপন্থীদের) চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন করা হয় মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকার যখন ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না, যখন দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা-অসুখবিসুখ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যখন ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থের সুযোগ জাতিগত-ধর্মগত-বর্ণগত-গোষ্ঠীগত ভেদ দূর করতে পারে না – তখন এ অবস্থায় উদারবাদের উত্তর কি?

ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদেরা প্রথমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণগুলোকে আক্রমণ করে শুল্ক, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ উঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিল। এদের সম্পর্কে ইতোমধ্যে (তৃতীয় অধ্যায়ে) এক কথায় বলেছি যে তাদের মূল কথা হলো "যেহেতু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারই সব উৎপাদককে সজাগ করে দেয়, সেহেতু বাজারকে একা থাকতে দাও – ঘাঁটিও না"। এদের যুক্তির মূল ভিত্তি হলো "ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল সবার জন্যই মঙ্গলজনক"। ইংল্যান্ডে এ ধারার প্রথম দিকের প্রবক্তা ডাড্‌লি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১) তার "Discourse upon Trade"-এ বললেন "বাণিজ্য হতে হবে অবাধ" (মুক্ত বাণিজ্য)। যুক্তি দিলেন: বাণিজ্যে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়, এতে পারদর্শিতা বাড়ে, শ্রম-বিভাজন উন্নততর হয় ফলে সম্পদ বাড়ে। আর এসবের পাশাপাশি মার্কেন্টাইলিস্টদের সমালোচনা করে ডাড্‌লি নর্থ বললেন যে নিয়ন্ত্রণমূলকব্যবস্থা বাণিজ্য হ্রাস করে ও বাণিজ্যকে সীমাবদ্ধ করে ফলে উল্লিখিত সব সুবিধে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃত সম্পদ হ্রাস পায়। ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) ১৭৫২ সালে নর্থের যুক্তি সমর্থন করে দেখালেন যে স্বয়ংক্রিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো পক্ষেরই বাণিজ্যের ভারসাম্য থাকতে পারে না।

ডাড্‌লি নর্থেরও কিছু আগে ইংল্যান্ডে দেশান্তরী এক ডাচ চিকিৎসক বানার্ড দ্য ম্যান্ডেভেইল (১৬৭০-১৭৩৩) (প্রদর্শ ৮ দেখুন) ১৭১৪ সালে 'মৌমাছিদের গল্প' (The Fable of the Bees) শীর্ষক জনপ্রিয় এবং বিতর্কিত ছন্দহীন কবিতার ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলেন (যার প্রচার সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়)। ম্যান্ডেভেইলের কবিতাটির প্রধান যুক্তি হলো এ রকম: "সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে পাপ কাজের ফল, পুণ্যের নয়। ব্যক্তির নিজ-স্বার্থ চরিতার্থ করার ফলেই উন্নয়ন আসে, যেমন আরাম ও আয়াসের ইচ্ছে থেকে, বিলাস আর আনন্দ থেকে। কঠিন পরিশ্রম করার বা সঞ্চয় করার বা অপরের মঙ্গল করার ইচ্ছা থেকে নয়। ব্যক্তির স্বার্থপরতার প্রেরণাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে সৌভাগ্য আর অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। স্বার্থপরতার পাপ মানুষকে তার লাভটা সর্বোচ্চ পরিমাণে তুলতে উৎসাহিত করবে এবং এইভাবেই তা জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করবে। এইভাবে পাপ প্রতিপালন করলে বাড়বে উদ্ভাবনী দক্ষতা। আর তার সাথে যদি সময় আর শিল্প জুড়ে দেয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, জীবনের যত সুবিধে, আসল স্ফূর্তি, আরাম আর আমোদ, এত বেশি অর্জিত হবে যে দরিদ্ররাও আগের দিনের ধনীদের চেয়ে ভালভাবে বাঁচবে, তাতে যোগ করার মতো আর কিছুই বাকি থাকবে না।" ম্যান্ডেভেইলের এসব কথাবার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট কিন্তু মারাত্মক অনৈতিক। আর মারাত্মক

এসব কথাবার্তা যতই অপ্রিয় হোক বা অশোভনীয় হোক আসলে এসবই হয়ে দাঁড়াল মুক্তবাজার সমর্থনকারী অর্থনীতিশাস্ত্র – ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম মৌল ভিত্তি। এর পরেও উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় চিন্তা-ভাবনায় 'দর্শনের দারিদ্র্যে'র আর অবশিষ্ট কি থাকতে পারে?

অষ্টাদশ শতকের উদারপন্থী অর্থনীতিবিদেরা কৃষি বা ব্যবসা কোনোটাকেই সম্পদের উৎস মনে করতেন না, তাদের মতে মানুষের শ্রমই সম্পদ সৃষ্টি করে। তারা বলতেন প্রাকৃতিক উৎপন্ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয়, এ সক্ষমতা অর্জন করতে হলে প্রাকৃতিক উৎপন্নকে মানুষের শ্রম দিয়ে পরিবর্তিত-রূপান্তরিত করতে হবে; উৎপাদনমূলক শ্রম ছাড়া প্রাকৃতিক সামগ্রীর মূল্য নেই। এই মতবাদকে "মূল্যের শ্রম তত্ত্ব" (Labor Theory of Value) বলা হয়। ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) শ্রম আর সম্পদের উৎপাদন-বিষয়ক ধারণার সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যুক্ত করে সম্পত্তির অধিকারকে উদারপন্থী মতবাদের অন্যতম প্রধান ভিত্তিতে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তী সময়ের উদারপন্থীরা শ্রম, সম্পদ এবং সম্পত্তি নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বললেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নিরাপদ করতে হবে অন্যথায় কাজে আগ্রহ কমে যাবে এবং তার ফলে সম্পদের উৎপাদন কমে যাবে।"

প্রদর্শ ৮: বানার্ড দ্য ম্যান্ডেভেইল

বানার্ড দ্য ম্যান্ডেভেইল (১৬৭০-১৭৩৩): ডাচ্ চিকিৎসক। যাঁর সম্পর্কে না বললে মুক্তবাজার অর্থনীতি তত্ত্বের আদি উৎস জানা যাবে না। ১৭০৪ সালে "মৌমাছিদের কল্পকাহিনী" (The Fable of Bees: or Private Vices, Publick Benefits) শীর্ষক ছন্দহীন কবিতাগুচ্ছ রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। ব্যঙ্গ কবি, দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ম্যান্ডেভেইলই সম্ভবত সর্বপ্রথম বলেন "সভ্যতার উন্নতি মানুষের পাপের ফল, পুণ্যের নয়। সুতরাং স্বার্থপর প্রেরণা অর্থাৎ পাপকে প্রেরণা দাও তাতে উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাবে" – এখান থেকেই আসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একদিকে সরকারি-রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ না করার যুক্তি আর একই সাথে অন্যদিকে মুক্তবাজার ও মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার তত্ত্বগত ভিত্তি। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উদারপন্থীবাদও এ ভিত্তিদর্শন মেনে বিনির্মিত হয়।

উৎস: ম্যান্ডেভেইল-এর জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অথবা ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক হিসেবে যার নাম বলা হয় তিনি হলেন এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)। ১৭৭৬ সনে প্রকাশিত হয় তার ধ্রুপদী গ্রন্থ "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (যা সর্বজনে The Wealth of Nations নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ)। স্মিথের 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market)-এর নাম শোনেনি এমন শিক্ষিতজন নেই বললেই চলে।

এডাম স্মিথ এক ধরনের 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থায়' (System of natural liberty) বিশ্বাস করতেন। "প্রাকৃতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা"-ভিত্তিক এ বিশ্বাসের মর্মবস্তু হলো: "প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার সুযোগ দিলে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই সর্বোত্তম পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি করবে।" তাঁর মতে এই সহজ সূত্রের ভিত্তিতেই একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থাতেও সামাজিক শৃংখলা-সংহতি গড়ে উঠবে। এডাম স্মিথের এ ধারণার সাথে ১৭০৪ সালে "মৌমাছিদের গল্প" রচয়িতা ম্যান্ডেভেইলের মারাত্মক অনৈতিক ও অশোভনীয় বক্তব্য "সভ্যতার উন্নতি মানুষের পাপ কাজের ফল, পূণ্যের নয়"-এর পার্থক্য কোথায়? এডাম স্মিথ বলছেন, "আমরা যে আমাদের খাবার আশা করি, সেটা কসাই, শৌন্ডিক বা রুটিওয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করে নয়, বরং তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই এটার সরবরাহ হবে। আমরা তাদের স্বার্থের সাথেই কথা বলি, তাদের মহানুভবতার সাথে নয়। আর আমাদের কি দরকার সেটা তাদের সাথে আলোচনা করি না বরং তাদের সুবিধাটাই আলাপের বিষয়বস্তু।" এডাম স্মিথের মতে, সরকারই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা। তবে সরকারকে স্মিথ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে চান তা স্পষ্ট নয়। স্মিথ একদিকে বলছেন যে 'এক অদৃশ্য হাত' বাজার ব্যবস্থার মধ্যস্থতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে উন্নতি নিশ্চিত করবে; আবার অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জনস্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রবণতা আছে সে বিষয়েও তিনি সচেতন। তাই এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "একই ব্যবসার লোকদের কদাচিৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এমন কি আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষেও নয়, কিন্তু দৈবাৎ যখনই তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়, তার উপসংহারে হয় জনসাধারণের বিপক্ষে কোনো ষড়যন্ত্র, না হয় জিনিসের দাম বাড়ানোর কূটকৌশল থাকবেই।" স্মিথের একথাটি যদি ঠিক হয় সেক্ষেত্রে তার "স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার" তত্ত্বের কি হবে?

অর্থনীতিশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভাবনা-গুরু এডাম স্মিথের 'দর্শনের দারিদ্র্য' একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এসবের বহিঃপ্রকাশের কয়েকটি নিম্নরূপ, (১) যা দিয়ে সর্বতোভাবে এবং প্রকৃতই সব সময় সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা যে 'শ্রম' সে কথা প্রমাণে এডাম স্মিথ বলেছেন, "শ্রমের সমান সমান পরিমাণের মূল্য শ্রমিকের কাছে সর্বকালে এবং সর্বস্থানে একই হতে বাধ্য। তার স্বাস্থ্যের, শক্তির এবং কর্মের স্বাভাবিক অবস্থায়, এবং তার যে গড়পড়তা কর্মকুশলতা আছে তাতে সে সর্বদাই তার বিশ্রামের, স্বাধীনতার এবং সুখের নির্দিষ্ট এক অংশ ত্যাগ করতে বাধ্য" (Wealth of Nations, খণ্ড ১, অধ্যায় ৫)। একদিকে, এ ক্ষেত্রে (সর্বত্র নয়) এডাম স্মিথ পণ্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হয় তা দ্বারা মূল্য নির্ধারণের সাথে শ্রমের মূল্য দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ গুলিয়ে ফেলেছেন, এবং তার ফলে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সমপরিমাণ শ্রমের মূল্য সর্বদাই সমান। অপরদিকে, তাঁর এই রকম একটা আন্দাজ আছে যে শ্রম যে হিসেবে পণ্যের মূল্যের ভিতর প্রকাশিত হয় সেই হিসেবে তা কেবল শ্রমশক্তির ব্যয় বলে পরিগণিত, কিন্তু তিনি এই ব্যয়কে কেবল বিশ্রাম, স্বাধীনতা, সুখ প্রভৃতির ত্যাগ বলে মনে করেন, কিন্তু একই সঙ্গে জীবিত প্রাণীর স্বাভাবিক কাজকর্ম হিসেবে নয়। কিন্তু তারপর, তাঁর চোখের সম্মুখে হয়েছে আধুনিক মজুরী-শ্রমিক।[১২] (২) 'কার্যকর চাহিদার' প্রকৃতি এবং আয় বণ্টনের ধরনের উপর এর নির্ভরশীলতা-বিষয়ক স্মিথের ধারণার সীমাবদ্ধতা অনেক। তার মতে, "উৎপাদন খরিদ্দারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে"। কিন্তু আসলে যা ঘটে তা হলো: আয়ের বণ্টন যদি অত্যন্ত অসম হয়, তবে ঐ ব্যবস্থায় ধনী বেশি পাবে আর দরিদ্রের জন্য থাকবে সামান্য। (৩) এডাম স্মিথ – সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাটা একাধারে প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং ঐ ব্যবস্থা সমর্থন করতেন। খাজনা আর মুনাফা স্পষ্টতই মানুষের শ্রমের ফল – নিজের স্বার্থের প্রেরণার মতো কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এটা স্মিথের বাজারকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের ধারণাটিকেই অযৌক্তিক করে দেয়।

এডাম স্মিথের ধ্রুপদী অর্থনীতি দর্শনের অন্যতম ভ্রান্তিকে বলা হয় – "এডামের বিভ্রান্তি" বা "এডামের যুক্তি-ভ্রান্তি" (Adam's Fallacy)। বিষয়টি এ রকম: এডাম স্মিথের আগে অর্থনীতিশাস্ত্র যখন সার্বভৌম সরকারদের বুদ্ধি পরামর্শ দিত যে কীভাবে সরকারি নীতিকৌশল বিশেষত সরকারি আর্থিক নীতি বিনির্মাণ করে বাজারের সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা সরকারের পক্ষে বাড়ানো যায় সেখানে স্মিথ অর্থনীতিবিদদের এ ভাবনা-ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি ভাবলেন সমাজ কীভাবে আরো বেশি ফলপ্রদ আরো বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে বাজারসহ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তিজীবনের সম্পর্কটা কেমন হতে হবে। তিনি বললেন, আধুনিক সমাজ বৃহৎ দুটি বর্গে বিভক্ত যার মধ্যে সংহতি হতে হবে: প্রথম বর্গ হলো ব্যক্তিজীবন, আর দ্বিতীয় বর্গ হলো সমাজজীবন। এরপর তিনি যা বললেন তা হলো এ রকম: অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির উদ্যোগ ও পারস্পরিক যোগসূত্র ব্যক্তি-নির্ভরহীন সূত্র দিয়ে পরিচালিত হয় যা ব্যক্তির নিজস্বার্থ বা স্ব-স্বার্থের জন্য উপকারী; আর ব্যক্তির স্ব-স্বার্থকেন্দ্রিকতার বাইরে আছে রাজনীতি, ধর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাসহ সমাজজীবন। এডাম স্মিথের মূল কথা হলো ব্যক্তির স্ব-স্বার্থের সাথে সামাজিক জীবনের সংহতি (বা সম্মিলন) হতে হবে – আর এ সংহতি সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ নিমিত্ত 'বাজারের অদৃশ্য হাত' (মুক্ত বাজার)। এ ক্ষেত্রে স্মিথের 'বিভ্রান্তি' (Adam's Fallacy) হলো তার স্ব-বিরোধী বক্তব্য যে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমন একটি প্রণালী বা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বার্থপরতা অন্য সবার মঙ্গল বয়ে আনে। এখানে স্মিথের অবস্থানের নৈতিক ভ্রান্তি (moral fallacy) হলো বিমূর্ত ভাল (abstract good) কোনো কিছু পাবার আশায় তিনি আমাদের মূর্ত ও প্রত্যক্ষ (concrete and direct) মন্দ বা শয়তানকে বেছে নিতে বলছেন। আর যুক্তিগত ভ্রান্তি (logical fallacy) হলো স্মিথসহ কেউই এ পর্যন্ত প্রমাণ করতে সক্ষম হননি যে কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সমষ্টির জন্য ভাল হয়; আর মনস্তাত্ত্বিক ব্যর্থতা (psychological failure) হলো স্মিথের যুক্তি মেনে নিলে পুঁজিবাদের উন্নয়ন ফল হিসেবে বৈষম্য থেকে শুরু করে কমজোরি সবার উপর পুঁজিবাদের ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত মেনে নিতে হয়।[১৩]

এডাম স্মিথের মতোই ধ্রুপদী রাজনৈতিক-অর্থনীতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)। মূলধন সঞ্চয়ের প্রবক্তা রিকার্ডোর মতে, যে কোনো দেশের অর্থনীতি সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় উৎস হলো মূলধনের প্রবৃদ্ধি। তাঁর মতে, সব অর্থনৈতিক কর্মপন্থা সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। এই মত প্রমাণের জন্য তিনি অর্থনীতির এক তাত্ত্বিক মডেল প্রণয়ন করেন যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছর অর্থনীতিবিদদের চিন্তাজগতে অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রিকার্ডোর এই মডেলে বলা হলো – যদি অর্থনীতিকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয় তবে সেটা একদিন সম্ভাব্য

[১২] পণ্যের মূল্য নির্ধারণ-সম্পর্কিত এডাম স্মিথের এ সমালোচনা করেছেন কার্ল মার্কস (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৭১)।

[১৩] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, Foley. K. Duncan. 2006, Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology. পৃ. xi-xiv, ১-৩, ২৮-৪৪

সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। তবে রিকার্ডোর মতে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবসাকে সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে যাতে মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, আর সর্বোচ্চ সঞ্চয় এবং পুঁজি সংগঠন সম্ভব হয়।

এডাম স্মিথের মতোই ডেভিড রিকার্ডোর বিশ্বাস – "সরকারি হস্তক্ষেপ উৎপাদন হ্রাস করে"। রিকার্ডোর অর্থনীতি তত্ত্বের অন্যতম শক্তি হলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা। অবাধ বাণিজ্য যে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের অর্থনৈতিক প্রগতির উপায় তা প্রমাণে তিনি প্রণয়ন করেন বিখ্যাত তুলনামূলক সুবিধার সূত্র (Law of Comparative Advantage)। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে যখন থেকে পণ্যমূল্য নির্ধারণে পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গৌণ হতে থাকে, তখন থেকে তুলনামূলক সুবিধার তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ভ্রান্তি স্পষ্ট হতে থাকে। বিষয়টি এ রকম: দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য বা পণ্য যেহেতু 'দুষ্প্রাপ্য' সেহেতু তার বাজারমূল্য বেশি হবে। পাট এবং কফি উভয়ই দুষ্প্রাপ্য কারণ এসব যে কোনো দেশে উৎপাদন হয় না, এসব উৎপাদনে আবহাওয়া, আর্দ্রতা, মাটির গুণাগুণ নিয়ামক উপাদান। ইচ্ছে করলেই ইউরোপে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাঁচা পাট উৎপাদন করা যাবে না। কিন্তু পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বাজারে দেখা যাচ্ছে যে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের এসব তুলনামূলক সুবিধের সাথে অনেক সময়ই আন্তর্জাতিক বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্য-মূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বিপরীতে এসব মূল্য নির্ধারণে কৃত্রিম কোনো সমীকরণ (যা উইলিয়াম পেটি এবং এডাম স্মিথ উভয়েই "মূল্যের রাজনীতি" বলে উল্লেখ করেছিলেন) কাজ করছে, কারণ এসবই উৎপাদন করে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার 'দরিদ্র' দেশ। সুতরাং এসব নিয়ে ডেভিড রিকার্ডোর চিন্তা-ভাবনা হয়ত বা তাঁর সময়কালে গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু তা সর্বজনীনতা পায়নি। এটাকে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যায়? রিকার্ডো তাঁর জীবনের শেষের দিকে এসে সচেতনভাবেই তাঁর অন্বেষার বিষয় হিসেবে বেছে নেন মজুরি ও মুনাফা এবং মুনাফা ও খাজনার ভেতরের শ্রেণি-স্বার্থগতদ্বন্দ্বকে (সম্ভবত শেষ জীবনে মানুষ আত্মঅন্বেষণ করে সত্যান্বেষী হবার চেষ্টা করেন!)। এই দ্বন্দ্বকে তিনি সরলচিত্তে সমাজের প্রাকৃতিক নিয়ম বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু, এই সময়েই বুর্জোয়া অর্থনীতি এমন এক সীমান্তে এসে পৌঁছুল, যা পেরিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার ছিল না। রিকার্ডোর জীবদ্দশাতেই তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হন, লিওনার্ড সিসমন্ডির তরফ থেকে।[১৪]

অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তা ইতিহাসে জেরেমি বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) সুখ বা উপযোগিতার (utility) তত্ত্ব যা আসলে সম্ভাবনাময় এক হস্তক্ষেপপন্থী মতবাদ বা interventionist doctrine (প্রদর্শ ৯ দেখুন)। বিষয়টি অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনগতভাবে নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াস। বেন্থাম বললেন, "প্রত্যেকটা কাজই যে পরিমাণে সুখ সৃষ্টি করে থাকে, নৈতিক বিচারে তা ঠিক ততটুকুই মূল্যবান।" তাঁর মতে, বহু মানুষের যদি সামান্য করেও সুখ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তা সামান্য কয়েকজন মানুষের প্রত্যেকের বিরাট পরিমাণ সুখ বৃদ্ধির চেয়ে ভাল। বেন্থামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বটি তত্ত্ব হিসেবে সুখপাঠ্য এবং আপাত দৃষ্টিতে "বেদনা-নাশক"। কিন্ত প্রশ্ন থেকেই যায় – আসলে উপযোগিতা কী, কার উপযোগিতা, কী তার পরিমাপ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বহুমানুষের সামান্য সুখ বৃদ্ধি গুটিকয়েক সুপার-ডুপার ধনীর সুখ হ্রাস করে সম্ভব কিনা? আসলে জেরেমী বেন্থাম তার উপযোগিতা তত্ত্ব দিয়ে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের মৌলিক অবদান "মূল্যের শ্রম তত্ত্ব"কে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অর্থনীতির শাস্ত্রীয় দর্শনকেই সঙ্কুচিত করে দিলেন। এসব বলে বেন্থাম আসলে মূল্যের শ্রম তত্ত্বকেই বিসর্জন দিলেন। অর্থনীতিশাস্ত্রে এ এক বড় মাপের পশ্চাদপসরণ।

জ্ঞানজগতের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আত্মস্থ করে তার নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণপূর্বক অর্থনীতিশাস্ত্রকে যিনি সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক (historical), সামূহিক (holistic), সর্বজনীন (universal) সাধারণ সূত্রের (general law, universal law) আওতায় কাঠামোবদ্ধ করে এ শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূরীকরণে চেষ্টা করেছেন তিনি হলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে এ কৃতিত্ব সম্ভবত এককভাবে মার্কসেরই – এ কথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না।

উল্লেখ্য যে এ গ্রন্থে আমি যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছি তা হলো: 'অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য'। সে নিরিখেই সঙ্গত কারণে এ গ্রন্থে কার্ল মার্কস অন্যের তুলনায় বেশি জায়গা নেয়ার দাবি রাখেন; এর অন্যথা মার্কসের প্রতি অবিচার সমতুল। অবশ্য মার্কস নিজে নিজেকে কখনও অর্থনীতিবিদ হিসেবে দাবি করেননি; তিনি নিজেকে একজন 'সমাজ সমালোচক', বা 'Social Critic' হিসেবেই মনে করতেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, এখন থেকে দুই হাজার বছর আগে জ্ঞানশাস্ত্রের মহাদার্শনিক এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২) কখনও নিজেকে দার্শনিক পরিচয়ে পরিচিত করেননি; এখন থেকে তিনশ বছর আগের ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের অন্যতম জনক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এনাটোমি, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুর-সঙ্গীত বিজ্ঞান (music) এবং পেশায় চিকিৎসক সপ্তদশ শতকের উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭)

[১৪] দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ২৫।

কখনও নিজেকে অর্থনীতিবিদ পরিচয়ে পরিচিত করেননি; ঊনবিংশ শতকের ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) যদিও সমাজবিজ্ঞানী (sociologist) হিসেবে পরিচিত কিন্তু তিনি ছিলেন অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান রচয়িতা (economic historian); জ্ঞান-গুরু জন কেনেথ্ গলব্রেথ (১৯০৮-২০০৬) এবং রবার্ট হেয়লব্রোনার (১৯১৯-২০০৫) অর্থনীতিবিদ হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ হলেও তাঁদের সমাজবিজ্ঞানী (sociologist) হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে; আর কেনেথ্ বোলডিং (১৯৯১০-১৯৯৩) যাকে অর্থনীতিবিদ বলা হয়ে থাকে তিনি আসলে ছিলেন দার্শনিক (এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে দেখুন প্রদর্শ ৯)।

প্রদর্শ ৯: জেরেমি বেন্থাম, ম্যাক্স ওয়েবার, জন কেনেথ্ গলব্রেথ, কেনেথ্ বোলডিং, রবার্ট হেয়লব্রোনার

জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২): ব্রিটিশ দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক। অর্থশাস্ত্রে "উপযোগিতা" (Uitility) ধারণার প্রবর্তক। যে ধারণা মতে প্রতিটি ক্রিয়া বা কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হওয়া উচিত সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা।

ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০): কার্ল ইমিল ম্যাক্সিমিলিয়ান ম্যাক্স ওয়েবার জার্মান দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ। অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান (economic sociology) ও ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (sociology of religion)-এ দুয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় পুঁজিবাদের (আধুনিকতার) উদ্ভবে ধর্মের ভূমিকা দেখিয়েছেন।

জন কেনেথ্ গলব্রেথ (১৯০৮-২০০৬): কানাডীয় বংশদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ। বিংশ শতকে আমেরিকান উদারবাদের অন্যতম প্রবক্তা। প্রথাসিদ্ধ অর্থনীতিতত্ত্বের কঠোর সমালোচক কারণ এই শাস্ত্র ধরে নেয় যে বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক আর অন্যদিকে বোঝে না যে অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা বৃহৎ কর্পোরেশনের হাতে। অর্থনীতিবিদদের "নির্বোধ পণ্ডিত" বলেছেন এজন্য যে তারা পরিশীলিত গাণিতিক বিশ্লেষণ করেন কিন্তু বাস্তব অর্থনৈতিক জগৎ বুঝতে ব্যর্থ।

কেনেথ্ বোলডিং (১৯১০-১৯৯৩): ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। একই সাথে শিক্ষা প্রচারক, শান্তি আন্দোলনকারী, কবি, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। বিবর্তনমূলক অর্থনীতির প্রবক্তা; অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জৈবিক বিবর্তনের মধ্যে মিল খুঁজেছেন; "মনস্তাত্বিক পুঁজি" (psychological capital) ধারণার প্রবর্তক।

রবার্ট হেয়লব্রোনার (১৯১৯-২০০৫): মার্কিন অর্থনীতিবিদ এবং "অর্থশাস্ত্র চিন্তার ইতিহাস" রচয়িতা। মনে করতেন "পুনর্বণ্টনমূলক কল্যাণরাষ্ট্র" শ্রেয়।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

আসা যাক অর্থনীতিশাস্ত্রকে দর্শনশাস্ত্রের নিরিখে শাস্ত্রীয় দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কস প্রসঙ্গে। অর্থনীতিশাস্ত্রে মার্কসের দর্শনটি তাঁর সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (Social Cosmology) অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সে কারণেই মার্কসের অর্থনীতিশাস্ত্র অন্য সবার তুলনায় ভিন্ন – তুলনামূলক পূর্ণাঙ্গ এক দর্শন। মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষায় বৃহৎবর্গের প্রধান তিনটি পরস্পর-সম্পর্কিত মৌল উপাদান হলো: (১) ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy; উইলিয়াম পেটি, এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোসহ যার দর্শনগত সারার্থ ইতোমধ্যে আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছি), (২) দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন (Dialectical and Historical Materialism; প্রধানত হেগেল ও ফয়েরবাখ), এবং (৩) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব (Utopian Socialism; টমাস মুর, টমাস কাম্পানেল্লা, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফোরিয়ার, লুই ব্লাঙ্ক – এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে প্রদর্শ ১০ দেখুন)।

প্রদর্শ ১০: টমাস মুর, টমাস কাম্পানেল্লা, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফোরিয়ার, লুই ব্লাঙ্ক

টমাস মুর (১৪৭৮-১৫০৫): ব্রিটিশ আইনজ্ঞ এবং পুনর্জাগরণ যুগের মানবতাবাদী সমাজ দার্শনিক। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রথম যুগের প্রবক্তা। গির্জার উপর রাজার অধিকার অস্বীকারের অপরাধে টমাস মুর-এর মাথা কেটে ফেলা হয়। 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে বলেছেন; ব্যক্তি নয় জনসাধারণই হবে সমস্ত সম্পত্তির যৌথ মালিক; সব নাগরিকই শ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্যের সমান মালিক; পরিবার হবে সমাজের মৌল একক; শাসন ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক; গ্রাম-শহরে এবং দৈহিক-মানসিক শ্রমে বৈরিতা থাকবে না; মানুষ ছ-ঘণ্টা কাজ করবে আর বাকি সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চিত্তবৃত্তি চর্চা করবে; শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ উন্নতি বিধান করা।

টমাস কাম্পানেল্লা (১৫৬৮-১৬৩৯): ইতালির দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ এবং কবি। ২৭ বছর কারাগারে বন্দী অবস্থায় রচনা করেন 'সিভিটাটিস সলিম' বা 'সূর্য নগরী'। এ সূর্য নগরী এক কল্পনারাজ্য যে রাজ্যে সার্বজনীন শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মালিকানা হবে যৌথ।

রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৫): ব্রিটেনের সমাজ সংস্কারক এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ও সমবায় আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নিজে স্কটল্যান্ডের নিউলানার্ক শহরের বস্ত্র কারখানার মালিক। তিনি শ্রমিকদের মালিকানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুনাফাখোরী ব্যবস্থা বন্ধ করে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাঁর মালিকানাধীন কারখানায় অনেক ধরনের মৌলিক সংস্কার কর্মকাণ্ড করেছিলেন। তিনি মনে করতেন এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির জীবন হবে পরিপূর্ণ ও সার্থক; তবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুগে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় পাদ্রি বন্ধুকে বলেছিলেন "আমি ব্যর্থ হইনি; আমি সময়ের গতির চেয়ে বেশি গতিতে হেঁটেছি।"

চার্লস ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭): দার্শনিক ফ্রাঙ্কো-ম্যারি-চার্লস ফোরিয়ার ছিলেন ফরাসি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী। একদিকে ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, আর অন্যদিকে বাস্তব পুঁজিবাদে শোষক ও শোষিতের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ফোরিয়ারকে এসব বৈপরীত্য বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে। ফোরিয়ার মনে করতেন মানুষ স্বভাবগতভাবে শোষক বা শোষিত নয়; মানুষের সব প্রবৃত্তিই তার সমাজ বা পরিবেশজাত। সুতরাং ঐ সমাজ ও পরিবেশ পরিবর্তন করে সবারই সুখ-স্বাচ্ছন্দ নিশ্চিত করা সম্ভব। আর লক্ষ্য বাস্তবায়নে ফোরিয়ার-এর প্রস্তাব হলো: মানুষের বৃহৎ সমাজকে স্বল্পসংখ্যক (৪০০ পরিবারের) উৎপাদনশীল কতকগুলি স্বল্পায়তন ফ্যালাঞ্জ বা বাহিনীতে বিভক্ত করা; ফ্যালাঞ্জই হবে ভবিষ্যৎ সমাজের মূল কোষ; ফ্যালাঞ্জের সদস্যরা প্রত্যেকেই সবরকম উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকবে (অর্থাৎ একঘেয়েমি শ্রমবিভাগ থাকবে না); উৎপাদিত সম্পদ ফ্যালাঞ্জের সদস্যদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দক্ষতা এবং শ্রমের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে; পুঁজিবাদী সমাজে শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে এ ধরনের সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। চার্লস ফোরিয়ারই প্রথম 'নারীবাদ' (Feminism) প্রপঞ্চটি উদ্ভাবন করেন।

লুই ব্লাঙ্ক (১৮১১-১৮৮২): ফরাসি রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক এবং সমাজতন্ত্রী সমাজ সংস্কারের প্রবক্তা। পুরো নাম লুই-জ্যঁ-জোসেফ-চার্লস ব্লাঙ্ক। বিশ্বাস করতেন যে নগর দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধানে সমবায় গঠন অপরিহার্য। "প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী শ্রম দেবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে"-এ তত্ত্বকথা তাঁর। বলা হয়ে থাকে "পুঁজিবাদ" প্রপঞ্চটি আধুনিক অর্থে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

মার্কসের সামাজিক বিশ্ববীক্ষা এ তিনটি বৃহৎবর্গের কোনো সরল সমষ্টি নয়; প্রতিটিকেই মার্কস তাঁর নিজের দর্শনচিন্তা মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজ দর্শন আবিষ্কারে প্রয়োগ করেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে অতীতের সব প্রচলিত ধারার বিপরীতে সম্পূর্ণ নিজস্ব-নতুনদর্শন বিনির্মাণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মার্কসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভিন্নধর্মী। যেমন হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে মার্কস নিঃশর্ত সমর্থন দেননি, বলেছেন "আমার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্ন তাই নয়, তার একেবারে বিপরীত। হেগেলের মতে, মনুষ্য মস্তিষ্কের জীবন প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তন প্রক্রিয়া, 'ভাব' নামে যাকে তিনি একটি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত করেছেন, তা হলো বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব জগৎ সেই 'ভাবের' দৃশ্যমান বাহ্যরূপ মাত্র। পক্ষান্তরে, আমার মতে মানব মনের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার যে বিভিন্ন রূপে পরিণত হয়, ভাব তা ছাড়া আর কিছুই নয়।...তাঁর (হেগেলের) ডায়ালেকটিকস মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মিথ্যে আবরণের আড়ালে যুক্তির শস্যকণাটিকে আবিষ্কার করতে হলে তাকে আবার ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।"[১৫]

শাস্ত্রীয়ভাবে তরুণ কার্ল মার্কস – মাত্র ২২ বছর বয়সী মার্কস – অর্থনীতির মানুষ ছিলেন না, ছিলেন আনুষ্ঠানিক অর্থে আইনশাস্ত্রে পড়াশোনা করা দার্শনিক। তরুণ দার্শনিক মার্কস প্রাথমিক অবস্থায় বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের পরিবর্তন-রূপান্তরের কার্যকারণ। আর এ প্রক্রিয়ায়ই হয়ে ওঠেন জ্ঞানজগতের সম্রাট যে সম্রাট নিজেকে নিছক জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় গণ্ডিবদ্ধ না রেখে সমাজ পরিবর্তন-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন "এতদিন দার্শনিকেরা পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, এখন প্রয়োজন তা পাল্টে ফেলা।"

মার্কসের অর্থনীতিশাস্ত্রী হয়ে ওঠার শুরুটা তখন, যখন তাঁর বয়স ২২ বছর, ১৮৪০ সালের দিকে। জার্মানির এক শহরে গাছ কাটার প্রতিবাদে তিনি স্থানীয় দৈনিক 'রেইনিস জাইটুং' পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন যেখানে আইনি বিষয়াদিই ছিল প্রধান। এ নিবন্ধের সমালোচনা করে মার্কসেরই চিরস্থায়ী সহযোদ্ধা ও বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (তখনও তাঁদের বন্ধুত্ব পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি) বলেছিলেন গাছকাটা সম্পর্কিত মার্কসের আইনি ব্যাখ্যা 'দুর্বল', এর রাজনৈতিক-

[১৫] কার্ল মার্কস, ১৯৮৮, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৩২-৩৩।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন (এ দুজনের বন্ধুত্বের শুরুটাও এখান থেকে)। এর আগে ইতোমধ্যে মার্কস ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করেন প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাসহ আইন, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্রসহ দর্শনশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়াদি। নিয়মিতভাবে অর্থশাস্ত্র নিয়ে মার্কসের ব্যাপক অধ্যয়নের কাজটি শুরু হয় ১৮৪৩ সালের শেষ ভাগে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। অর্থনীতিসাহিত্য নিয়ে পড়াশোনার সময় প্রথম থেকেই তিনি এক মহাগ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করেন, যে গ্রন্থের সারমর্ম হবে বর্তমান ব্যবস্থা অর্থাৎ উঠতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনা। এ লক্ষ্যে তাঁর প্রাথমিক গবেষণা কর্মফলের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো: 'অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি' (১৮৪৪), 'জার্মান ভাবাদর্শ' (১৮৪৫), 'দর্শনের দৈন্য' (১৮৪৭), 'মজুরিশ্রম ও পুঁজি' (১৮৪৭), 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের সাথে যৌথভাবে, ১৮৪৮ সালে), 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' (তিন খণ্ডে, ১৮৬২) ইত্যাদি। মার্কসের এসব রচনায় পুঁজিবাদী শোষণের মূলনীতি, পুঁজিপতি এবং মজুরিশ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে আপসহীন বৈপরীত্য, পুঁজিবাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈরিভাবাপন্ন ও অস্থিতিশীল চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

'পুঁজি' (Das Capital) গ্রন্থটি অর্থনীতিশাস্ত্রে মার্কসের অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত অবদান। মার্কস নিজেই বলেছেন "এ গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো আধুনিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম প্রকাশ করা"। আর মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ নিয়ে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস লিখেছেন, "পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের অভ্যুদয়ের পর থেকে পৃথিবীতে শ্রমিকদের জন্য এর মতো এমন গুরুত্বসম্পন্ন একটি গ্রন্থও বের হয়নি, যেটি আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে"। মার্কস তাঁর জীবনের প্রধান এ গ্রন্থটি রচনা করেন চার দশক ধরে – ১৮৪৩ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন (১৮৮৩) পর্যন্ত।

কার্ল মার্কসের অর্থনীতি দর্শন সংকীর্ণ অর্থের অর্থশাস্ত্র নয় তা রাজনৈতিক অর্থনীতি। মার্কসের অমর গ্রন্থ 'পুঁজি' বা Das Capital-ই তার সহজ প্রমাণ যেখানে এই গ্রন্থের সাব-টাইটেল 'Critique of Political Economy' এবং এ গ্রন্থের ফরাসি সংস্করণের পূর্বাভাসে (১৮৭২ সাল) মার্কস বলছেন, "আমি বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, ইতোপূর্বে অর্থনীতি বিষয়ে যা কখনো অবলম্বিত হয়নি।...বিজ্ঞানের দিকে যাওয়ার কোনো রাজপথ নেই, শুধু তারাই তার উজ্জ্বল শিখরে পৌঁছাতে পারে যারা ক্লান্তিদায়কতার চড়াই বেয়ে ওঠার ভয় পায় না"[১৬]

'পুঁজি' গ্রন্থে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণামকে কার্ল মার্কস তিন খণ্ডে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের (Production) প্রশ্ন; দ্বিতীয় খণ্ডে – পুঁজিবাদী সঞ্চলনের (Circulation) প্রশ্ন; আর তৃতীয় খণ্ডে – সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রশ্ন (Capitalistic production as a whole)। বলা সঙ্গত যে এ গ্রন্থে অর্থনীতিশাস্ত্রকে মার্কস যে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট হয়েছেন তার কয়েকটি কারণ-লক্ষণ হতে পারে নিম্নরূপ, যা মার্কসেরই ভাষায়:

১. "সমগ্র জৈবসত্তা হিসেবে জীবদেহের অনুশীলন সেই দেহস্থিত কোষগুলির (cells) অনুশীলন থেকে অনেক সহজ। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক রূপসমূহের বিশ্লেষণে অণুবীক্ষণযন্ত্র কিংবা রাসায়নিক বিকারক কোনো কাজে লাগে না। বিমূর্তনের শক্তিকেই (power of abstraction) উভয়ের স্থান গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমজাত দ্রব্যের পণ্যরূপ – অথবা পণ্যের মূল্যরূপ – হলো অর্থনৈতিক কোষস্বরূপ। যারা তলিয়ে দেখে না তাদের কাছে এইসব রূপের বিশ্লেষণ খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো বলে মনে হবে। এগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু তা শারীরস্থানের আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের মতোই।"[১৭]

২. "পদার্থবিজ্ঞানী যখন কোনো ভৌত বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন, তখন হয় তিনি এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে বস্তুটি অন্যান্য জিনিসের বিঘ্নকর প্রভাব থেকে মুক্ত নিজস্ব বিশুদ্ধরূপে উপস্থিত থাকে, অথবা তিনি এমন এক অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান যেখানে বিশুদ্ধরূপেই বস্তুটিকে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আমাকে উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি এবং উক্ত পদ্ধতির অনুষঙ্গী উৎপাদন ও বিনিময়ের অবস্থা পরীক্ষা করতে হয়েছে। অদ্যাবধি ইংল্যান্ডই এ উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ল্যাসিক ক্ষেত্র।"[১৮]

৩. "মূলত প্রশ্নটি এই নয় যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বাভাবিক নিয়মাবলি থেকে উদ্ভূত সামাজিক দ্বন্দ্বের বিকাশের মাত্রা কম না বেশি। প্রশ্নটি হলো সেই নিয়মাবলি সম্বন্ধেই, সেই প্রবণতাগুলি সম্বন্ধেই, অমোঘ ভবিতব্যের

[১৬] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৩৬
[১৭] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ১৯
[১৮] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ১৯

মতো যা অবশ্যম্ভাবী ফল প্রসব করে। শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত দেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের সামনে তুলে ধরে তারই ভবিষ্যতের ছবি।"[১৯]

৪. "আমি সমাজের অর্থনৈতিক গঠনরূপকে দেখেছি প্রাকৃতিক ইতিহাসেরই একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, তাই আমার দৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষ যে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি, সে নিজে কখনই তার জন্য দায়ী হতে পারে না"।[২০]

৫. "আজকাল বিদ্যমান মালিকানা-সম্পর্কের সমালোচনার তুলনায় নাস্তিকতা তো *culpa levis* [লঘু অপরাধ]।"[২১]

৬. "দাস প্রথার বিলুপ্তির পর পুঁজি এবং ভূ-সম্পত্তিঘটিত সম্বন্ধের আমূল পরিবর্তন প্রত্যাসন্ন। এগুলো হলো যুগের লক্ষণ, লাল রাজপোশাক কিংবা পুরোহিতের কৃষ্ণ উত্তরীয়, কোনো কিছু দিয়েই তা ঢাকা যাবে না।...তার মানে...বর্তমান সমাজ স্ফটিকদানার মতো নিরেট নয়, এ সমাজ জীবদেহের মতো পরিবর্তনীয় এবং নিরন্তরই তার পরিবর্তন ঘটছে।"[২২]

আমি সচেতনভাবেই কার্ল মার্কসের নিজ ভাষ্যের এসব বিষয় উত্থাপন করলাম এ জন্যে যে মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে বিশ্লেষিত পুঁজিবাদের উদ্ভব-বিকাশ-পরিণামের কার্যকরণ সম্পর্ক কখনও বোঝা সম্ভব নয় যদি গবেষণার পদ্ধতিতাত্ত্বিক (Methodology of Research) উল্লিখিত বিষয়াদি অনুধাবন না করা যায়। এ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলাম এ জন্যেও যে মার্কসই তার পুঁজি গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের উত্তরাভাষে লিখেছেন 'পুঁজি' গ্রন্থে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা যে কেউ বোঝেনি তা বোঝা যায় সে সম্বন্ধে নানা পরস্পরবিরোধী ধারণা থেকেই।"[২৩]

১৮৫০ সাল নাগাদ কার্ল মার্কস আধুনিক অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ রাজনৈতিক-অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শন জগতে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বলা চলে তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' অপবাদ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় মুক্তি ঘটাতে মার্কসকে আবিষ্কার করতে হয়েছে অনেক তত্ত্ব যার অন্যতম হলো: আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (Socio-economic Formation) তত্ত্ব, শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব,[২৪] পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্ব[২৫], পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্ব (capitalism as a system of universal commodity production), পণ্যের বিনিময় মূল্য নিরূপণে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) তত্ত্ব, সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের (extended reproduction) তত্ত্ব ইত্যাদি।

মার্কস-ই প্রথম যিনি বললেন যে রাজনৈতিক অর্থনীতিশাস্ত্র হবে সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের (production relations) সাথে উৎপাদিকা শক্তির (productive forces) আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়কারী শাস্ত্র, যেখানে মূল কথা হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন

---

[১৯] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ১৯-২০

[২০] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ২১

[২১] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ২১

[২২] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ২২

[২৩] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৩০

[২৪] এ প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন "ইতোপূর্বে যেসব সমাজ দেখা গিয়েছে, তাদের সকলেরই ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস" (বিস্তারিত দেখুন, Marx, Karl and F. Engels. 1848. The Communist Manifesto)।

[২৫] যা 'পুঁজি' গ্রন্থে তো বিস্তারিত আছেই। তারও আগে মার্কস অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গ গ্রন্থে (১৮৫৯ সালে) লিখেছেন— তারপরই "সমাজ বিপ্লবের যুগ শুরু হয়" ('Then begins the era of social revolution'); ঘটে যায় 'উচ্ছেদকদের উচ্ছেদ' ('expropriators are expropriated')। বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এ পাদটিকায় একটু বিস্তারিত উদ্ধৃত করা হলো। মার্কস লিখেছেন, "অধ্যয়ন চালিয়ে যে সাধারণ সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হলাম এবং একবার উপনীত হওয়ার পর যা আমার অধ্যয়নের পথ-নির্দেশক নীতি হয়ে উঠল তার সারসংক্ষেপ উপস্থিত করা যায় নিম্নলিখিতভাবে। তাদের জীবনীয় সামগ্রীর সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, মানুষে মানুষে অবশ্যম্ভাবীরূপেই নির্দিষ্ট কতকগুলি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেগুলি তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, যথা তাদের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশে এক নির্দিষ্ট স্তরের উপযুক্ত উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলির সামগ্রিকতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রকৃত বনিয়াদ, যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট রূপের সামাজিক চৈতন্য যার অনুষঙ্গী। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্যকে নির্ধারিত করে। বিকাশের এক বিশেষ স্তরে বিদ্যমান উৎপাদনসম্পর্কের সঙ্গে কিংবা— একই কথা শুধু আইনগত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে— এযাবৎ সেগুলি যার কাঠামোর মধ্যে কাজ করেছে সেই মালিকানা-সম্পর্কের সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনশক্তিগুলির সংঘাত বাধে। এই সম্পর্ক উৎপাদন শক্তিগুলির বিকাশের আকার থেকে পরিণত হয় তাদের শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সমাজবিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে, আগেই হোক অথবা পরেই হোক, সমগ্র বিশাল সৌধটির রূপান্তর ঘটে। এরূপ রূপান্তর বিচার-বিশ্লেষণ করার সময়ে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতো যথাযথভাবে যা নির্ধারণ করা যায় উৎপাদনের সেই অর্থনৈতিক পরিবেশের বৈষয়িক রূপান্তর, আর আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিল্পকলাগত ও দার্শনিক— সংক্ষেপে, যে-সমস্ত মতাদর্শগত রূপের মধ্যে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয় ও লড়াই করে তা দূর করে, এই দুয়ের মধ্যে সর্বদাই প্রভেদ নির্ণয় করা দরকার" (দেখুন, কার্ল মার্কস, ১৯৮৩, অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে, মস্কো: প্রগতি প্রকাশনা, পৃ. ১৩)।

সম্পর্ক যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নির্ধারণ করবে, তেমনি উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধার কারণ হলে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ককে বিদায় নিতে হবে (এটাই প্রণালীর বা সিস্টেমের 'মৃত্যুঘণ্টা'; এটাই সমাজ বিপ্লবের সূচনালগ্ন)। এ অর্থে মানুষের বিকাশ, সমাজের বিকাশ, সভ্যতার বিকাশ কোনো অনড়-স্থির (static, stationary status) বিষয় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল-গতিময় (ever changing, dynamic) বিষয়। এ বিষয়ের বিশ্লেষণে মার্কসই প্রথম দেখালেন সভ্যতার ইতিহাসে পাঁচ ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার (socio-economic formation) উপস্থিতি: (১) আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) দাস উৎপাদন ব্যবস্থা, (৩) সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, এবং (৫) সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (যার প্রথম স্তরকে বলা হয় সমাজতন্ত্র)। মার্কস দেখালেন যে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্ববৈশিষ্ট্যের উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) আছে। আর প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক (production relation) ও উৎপাদিকা শক্তির (productive force) দ্বান্দ্বিক সমাহার। যেখানে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রধান নিয়ামক হলো উৎপাদনের উপায়ের (means of production – যেমন জমি, জলা, যন্ত্রপাতি-কলকারখানা ইত্যাদি) উপর মালিকানার ধরন (হতে পারে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ঐতিহ্যগত, প্রথাগত, সর্বজনীন ইত্যাদি)। উৎপাদনের উপায়-এর মূল উপাদান হলো শ্রমের বস্তু ও শ্রমের উপায় বা হাতিয়ার। আর উৎপাদিকা শক্তির প্রধান তিনটি মৌল উপাদান হলো: (১) উৎপাদনী অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাসহ শ্রমশক্তি – মানুষ, (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (৩) উৎপাদনের উপায়। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ নিরন্তর। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা সমাজ-অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে তখন, যখন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[২৬]

কার্ল মার্কস অর্থনীতিশাস্ত্রকে যে 'দর্শনের দারিদ্র্য' থেকে উদ্ধার করে সমগ্র শাস্ত্রটিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে শক্ত পায়ের উপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছেন তার কারণ-সংশ্লিষ্ট দু-একটা উদাহরণ দেয়া সঙ্গত হবে। এ সবই মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে আছে। আর এসব নিয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসে মার্কসের আগে কেউই তেমন ভাবেননি অথবা ভাবলেও ভাবনা অপূর্ণাঙ্গ। প্রথমত: অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে মার্কসই প্রথম যিনি পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ শুরু করেছেন সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দিয়ে নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত 'একক পণ্য' দিয়ে, যেখানে একক একটি পণ্য হলো তা যার মধ্যে পুঁজিবাদের সব দ্বন্দ্বসংঘাত ঘনীভূত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। এ মর্মে মার্কস লিখেছেন, "যে সমস্ত সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির প্রাধান্য বর্তমান, সেখানকার ধনসম্ভার পণ্যের এক বিপুল সমারোহরূপে দেখা দেয়, আর এক-একটি পণ্য এ ধনসম্ভারের প্রাথমিক রূপ হিসেবে দেখা দেয়। সে কারণেই আমার গবেষণাও শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ থেকেই।"[২৭] দ্বিতীয়ত, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে কেউই ঠিক করে বলতে পারল না কী সেই নিগুড় কারণ, কী সেই রহস্য যার ফলে দুটো পণ্যের মধ্যে বিনিময় হয় (exchange)। মার্কসই প্রথম এ কারণ উদ্‌ঘাটন করে পুঁজি গ্রন্থে লিখলেন, "একদিকে সমস্ত শ্রমই হলো শারীরবৃত্তের দিক থেকে, মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, এবং একই রকম বিমূর্ত মানবিক শ্রম হিসেবে, তা পণ্য মূল্য সৃষ্টি এবং গঠন করে। অপর দিকে সমস্ত শ্রমই হলো এক-একটি বিশিষ্টরূপে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সম্পাদিত মানুষের শ্রমশক্তি, এবং তার ফলে, উপযোগী শ্রম হিসেবে তা তৈরি করে ব্যবহার মূল্য।"[২৮]

এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে মার্কসের অনুসারীদের একটা সহজাত প্রবণতা আছে তা হলো: যা মার্কসের অবদান নয় সেটাও (সম্ভবত অজ্ঞতার কারণে) মার্কসের নামে চালিয়ে দেয়া; আর যেখানে মার্কসের অবদান ঐতিহাসিক- মৌলিকতম তা উচ্চারণ না করা (এটাও সম্ভবত অজ্ঞতার কারণেই)। যেমন অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেই অনেকেই বলে ফেলেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব অথবা মূল্যের শ্রম তত্ত্বের স্রষ্টা মার্কস – আসলে উভয়ই ভ্রান্ত ধারণা, এ দুয়ের কোনোটিই মার্কসের আবিষ্কার নয়। উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্বকথা মার্কসের বেশ আগেই বলেছেন ফিজিওক্রাট ফ্রাঁসোয়া কেনে্ এবং ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের উইলিয়াম পেটি এবং এডাম স্মিথ, আর মূল্যের শ্রম তত্ত্বের বিষয়টিও মার্কসের আগে এডাম স্মিথ বলেছেন – বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস শুধু তার স্ব-উদ্ভাবিত পদ্ধতিতত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান দিয়ে এ দুটি তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করে ভিন্ন আঙ্গিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন। আবার অর্থশাস্ত্রে মার্কসের ঐতিহাসিক মৌলিকতম আবিষ্কারের অনেক বিষয়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থেকে যায়। যেমন পুঁজিবাদের উৎপাদন অথবা পুঁজিবাদী সিস্টেম বুঝার ক্ষেত্রে "একক পণ্যের বিশ্লেষণ" (Analysis of single commodity when capitalism is a system of universal commodity production); পণ্যের মূল্য-সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্যের নিগূঢ় অর্থ; এবং সবচে মৌলিক বিষয় যা মার্কসকে অন্তত অর্থশাস্ত্রে মার্কস হিসেবে অমরত্ব দিয়েছে – "বিনিময় মূল্য নির্ধারণে অথবা পণ্যমূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রম" (Theory of

[২৬] এসব বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত, ১৯৮৫, বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য, পৃ. ১৫-২১

[২৭] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৫৭

[২৮] কার্ল মার্কস, পুঁজি, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৭১

Abstract Labor), এবং "পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের প্রকৃতি" (Dual nature of labor embodied in a commodity)।

এ কথাগুলো বললাম অনেক কারণে, যার অন্যতম হলো আমার দু-একটি প্রায়োগিক বাস্তব ধারণা (যা সম্ভবত অভ্রান্ত, তবে ভ্রান্ত হলে আশ্বস্ত হব) –"বুঝেসুঝে কার্ল মার্কসের দর্শনের অনুসারী হওয়া কোনো সহজ ব্যাপার নয়", "ঘোষণা করে মার্কসবাদী হওয়া যতটা সোজা মার্কসবাদ আত্মস্থ করা ততটা সোজা নয়"; "যেখানেই মানুষ যত বেশি শোষিত-নিষ্পেষিত-নির্যাতিত-বঞ্চিত হবে, সেখানেই মার্কসবাদী হবার চাহিদা তত বাড়বে"। তবে মার্কসের 'পুঁজি' (Das Capital) গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত বিষয়াদি না বুঝে অথবা ভুল বুঝে যে উপকারও হয়নি তা নয়। যেমন রাশিয়ায় জার সম্রাটের আমলে (১৮৭০-এর দিকে) মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের জন্য গ্রন্থটি যখন জার-সম্রাটের সেন্সর বোর্ডের কাছে পাঠানো হলো তখন জার সম্রাটের আজ্ঞাবাহী সেন্সর বোর্ড না বুঝে অনুমতি দিল এই বলে যে "গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হলো কীভাবে একজন ভাল পুঁজিপতি হওয়া যায় তার পথ নির্দেশনা দেয়া" ("A guide about how to be a good capitalist")। আবার মার্কসের তত্ত্ব দর্শন আত্মস্থ না করেই অনেকে নিজেকে মার্কসবাদী হিসেবে ঘোষণা করে অনেকটা ধর্মের গোঁড়ামি অথবা অন্ধত্বের শিকার হয়ে মৃত মার্কসের তেমন ক্ষতি করতে পারেননি তবে ক্ষতি করেছেন সমাজের বিশেষত রাজনৈতিক সমাজের।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিশাস্ত্রকে মূল্যের শ্রম তত্ত্বটা বিসর্জন দিতে হলো । না বসে থেকে তারা আয় বণ্টন (income-distribution) ও ব্যবসা-চক্রের (business cycle) দিকে মনোযোগ দিয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে নতুন পথের সন্ধান খুঁজলেন। নতুন পথের মূল বক্তব্যটা বেশ সোজাসাপ্টা: কোনো দ্রব্য বা সেবার মূল্য ঐ দ্রব্যে বা সেবায় কতটা শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে নির্ধারিত হবে না বরং তা ঠিক হবে যা কেনা হয়েছে তার শেষ এককটা কি পরিমাণ প্রয়োজন (উপযোগিতা) মিটিয়েছে তা দিয়ে। এটাই বিখ্যাত প্রান্তিক উপযোগনীতি (Principle of marginal utility)। এ হলো বেন্থামীয় উপযোগবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব। প্রান্তিক উপযোগের এ নীতিটা বিশ্লেষণ করেছেন লিও ওয়াল্রাস (১৮৩৪-১৯১০), উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভনস্ (১৮৩৫-১৮৮২), কার্ল মেন্গার (১৯০২-১৯৮৫) (প্রদর্শ ১১ দেখুন)। প্রান্তিক উপযোগের নীতিটি মেন্গার বুঝিয়েছেন ক্রেতার প্রান্তিক (বা শেষ) এককের তৃপ্তি দিয়ে; জেভনস দেখালেন যে প্রান্তিক অবস্থানে উপযোগিতা হ্রাস পায়; আর ওয়াল্রাস দেখালেন কেমন করে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ক্রেতার খরচ করবার সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযোগবাদ আর প্রান্তিক উপযোগনীতির ধারণাগুলি অর্থনীতিশাস্ত্রের পুরো কেন্দ্রবিন্দুকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শ্রেণি বিভাজন আর তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চিন্তা থেকে সরিয়ে দিল – সরিয়ে দিল সেখান থেকে যার উপর ইতিপূর্বে ডেভিড রিকার্ডো এবং কার্ল মার্কস জোর দিয়েছিলেন। অর্থনীতিশাস্ত্র সমষ্টির চিন্তাদর্শন ও সামাজিক চিন্তাদর্শন থেকে একক ব্যক্তির এবং ব্যক্তি ক্রেতার (individual consumer) সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হলো। অর্থনীতিশাস্ত্রের এ এক মহাপশ্চাৎপদতা। পুঁজিবাদে যখন বৈষম্য ক্রমবর্ধমান, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যখন জরুরি, আয়-বণ্টননীতি যখন আরো গভীর গবেষণার দাবি রাখে, সমষ্টির চিন্তা ও সামাজিক চিন্তা যখন আরো বেশি প্রয়োজন, পণ্য-দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ নিয়ে যখন আরো অনেক ভাবনা জরুরি, তথ্য অসামঞ্জস্য (information asymmetry) যখন বাস্তবতা, ঠিক তখনই একক ব্যক্তি এবং একক ক্রেতা-ব্যক্তি নিয়ে এ অতিভাবনা দুর্ভাবনারই বিষয়। এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এসব করে প্রকৃত অর্থে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' বাড়ানো হলো। বলা চলে এসব করে অর্থনীতিশাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' চিরস্থায়ীকরণের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করা হলো।

প্রদর্শ ১১: লিও ওয়াল্রাস, উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স, কার্ল মেনগার

লিও ওয়াল্রাস (১৮৩৪-১৯১০): ফরাসি অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিতে সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষক (General equilibrium analysis)। এ মডেলে তিনি দেখালেন যে যেকোনো অর্থনীতি-সিস্টেমকে বেশ কিছু গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে বুঝানো সম্ভব, এবং মূল্যস্তর ও দ্রব্যের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও এসব সমীকরণ সমাধান করা সম্ভব। অবশ্য লিও ওয়ালরাসের প্রায় দেড়শ বছর আগে রিচার্ড ক্যানটিলোন (১৬৮৭-১৭৩৪) ও ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪) অর্থনীতিতে সিস্টেম এপ্রোচ প্রচলনে বিভিন্ন সেক্টরের আন্তঃসম্পর্ক দেখিয়েছিলেন। আর উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স (১৮৩৫-১৮৮২) ও কার্ল মেন্গার (১৯০২-১৯৮৫) এর পাশাপাশি তিনিও 'প্রান্তিক উপযোগ'-এর ধারণা আবিষ্কার করেন।

উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্স (১৮৩৫-১৮৮২): ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ। যেসব ধারণা প্রবর্তনের জন্য তিনি পরিচিত তার অন্যতম হলো: তুলনামূলক মূল্যতত্ত্ব অথবা প্রান্তিক উপযোগের ভিত্তিতে বিনিময় মূল্য, প্রবৃদ্ধি

তত্ত্ব, ব্যবসায়-চক্র তত্ত্ব। *কার্ল মেন্‌গার (১৯০২-১৯৮৫):* অর্থনীতিশাস্ত্রে অস্ট্রীয় স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অস্ট্রিয়ান অর্থনীতি স্কুলের ২টি স্তম্ভের বিনির্মাতা: (১) মূল্যের ইচ্ছাধীন (subjective) তত্ত্ব (অর্থাৎ দ্রব্যের মূল্য আছে কারণ তা আমাদের চাহিদা মেটায়, আর ঐ মূল্য নিরূপিত হবে উপযোগিতা অথবা চাহিদা দিয়ে), (২) প্রমাণিত অনুমান-নির্ভর বিষয়াদির ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থনীতির জ্ঞানার্জন সম্ভাব্যতা।

উৎস: প্রদর্শে উল্লিখিত প্রত্যেকের জীবনী ও লেখনী পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' কীভাবে চিরস্থায়ীকৃত হলো এতক্ষণ সেসবের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্রীয় কয়েকটি দিক না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর তা হলো এই যে অর্থনীতিশাস্ত্রের এ দারিদ্র্য চিরস্থায়ীকরণের প্রয়াসে দোষটা অর্থনীতিবিদদের না কি অর্থনীতিশাস্ত্রের না কি উভয়েরই? যদিও ইতোমধ্যে এ প্রশ্নের কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে তথাপি আরো একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। আর সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ: অর্থনীতিবিদেরা এমন এক শ্রেণির মানুষ যাদের বলা যায় "অর্থনীতিবিদ শ্রেণি", যাঁরা এমন ভাবুক যে 'ক্ষুদ্রার্থের' অর্থনীতিশাস্ত্রের বাইরে বিচরণে তাঁরা অপারগ। এ অপারগতায় তাঁদের খুব দোষ নেই; দোষ অর্থনীতিশাস্ত্রেরই অন্তর্নিহিত; দোষ অর্থশাস্ত্রের যে ধারা অথবা স্কুল তাঁরা অনুসরণ করেন সেখানেই বড় মাপের গলদ আছে (এসব 'স্কুল' নিয়ে ইতোমধ্যে ছক ১-এ বলা হয়েছে)। এ গলদ সাধারণ কোনো গলদ নয়। এ গলদ প্রধানত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ধারণাগত সংকট-উদ্ভূত – প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করতে পারার সংকট। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ কাপ্‌রার মতে বিষয়টি এ রকম, "উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব, জ্বালানী সংকট, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংকট, দূষণ ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয়, সন্ত্রাস ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত, এবং অনুরূপ সবকিছু – এসবই একই সংকটের বিভিন্নমুখী চেহারা। সংকটটি মূলত উপলব্ধির সংকট।"[২৯]

সামাজিক বিজ্ঞানীরা মানুষের স্বভাব-আচরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক নিয়ে ভাবেন। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির অন্যতম হলো অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান, এমনকি ইতিহাসশাস্ত্র। পুরো গত শতক আর এ শতকের এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণে সামাজিক বিজ্ঞানীরা মূলত কার্টেজীয় ধারণাকাঠামো (Cartesian fremework) ব্যবহার করেছেন। কার্টেজীয় এ ধারণা কাঠামো অনুযায়ী দার্শনিক দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব (যেখানে বলা হতো বস্তুর গতির আদি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর; মানুষ হচ্ছে দেহ এবং মনের সম্মিলিত সংগঠন; দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা; "আমার নিজের অস্তিত্ব সন্দেহের ঊর্ধ্বে") থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে বলা হলো মানবিক-সামাজিকবিজ্ঞানের কাজ 'মন' (*res congnitans*) নিয়ে আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের কাজ 'বস্তু' (*res extensa*) নিয়ে। বিজ্ঞানী ফ্রিটজফ বলছেন – প্রকৃত অর্থে বিশ্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও উপস্থাপনে প্রয়োজন হলো কার্টেজীয় ধারণা কাঠামো থেকে বেরিয়ে "ইকোলজিক্যাল চিন্তা-অবস্থান" গ্রহণ করা। অর্থাৎ যে বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতের সম্পর্ক আলোচিত হয়। দেকার্ত ও কার্টেজীয় ধারণা-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব কথাবার্তা দর্শনশাস্ত্রীয় বিধায় অর্থনীতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু, জ্ঞানতত্ত্বীয় এসব বিষয় আদৌ অপ্রয়োজনীয় নয়। কারণ নিউটনের পদার্থবিদ্যা-বলবিদ্যা আর কার্টেজীয় প্যারাডাইম – এ দুয়ের সমন্বয়ে সামজিক বিজ্ঞানীরা বিশেষত অর্থনীতিবিদেরা এতকাল স্ব-শাস্ত্রীয় যেসব বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মডেল বিনির্মাণ করে চলেছেন সেসবই প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে বাস্তবের সাথে যোগসূত্রহীন শাস্ত্র হিসেবে। বর্তমান যুগের অর্থশাস্ত্র সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সব জ্ঞান-শাখার মতোই খণ্ডিত ও লঘুকৃত এপ্রোচ (fragmented and reductionist approach) দ্বারা পরিচালিত – যা আগেও বলেছি। এসব কারণেই প্রচলিত অর্থনীতিবিদেরা অর্থাৎ 'অর্থনীতিবিদ শ্রেণি' বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে অর্থনীতিশাস্ত্র সামূহিক-সামগ্রিক ইকোলজিক্যাল ও সোশাল সিস্টেমের ক্ষুদ্র একটি দিক মাত্র যেখানে জীবন্ত ঐ সিস্টেমে মানুষ একে অন্যের সাথে এবং প্রকৃতির সম্পদের সাথে প্রতিনিয়ত সম্পর্কিত, যে প্রকৃতির বেশির ভাগই প্রাণ-বিশিষ্ট সত্তা। এসব কিছু বিবেচনা করে সামাজিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নির্দেশে ফ্রিটজফ বলছেন, "সামাজিক বিজ্ঞানের মৌলিক ভ্রান্তি হলো এই যে তারা এ সামূহিক-আন্তঃসম্পর্কিত গঠন-কাঠামোকে বিভাজিত করে খণ্ডিত করে, এবং প্রতিটি অংশকে ভিন্ন অংশ মনে করে বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগে চর্চা করে, এভাবেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক শক্তির মৌল বিষয়াদি অবজ্ঞা করেন আর অর্থনীতিবিদেরা তাদের মডেলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যুক্ত করতে ব্যর্থ হন। ... অন্য আরো একটা অতীব গুরুত্ববহ বিষয় যা অর্থনীতিবিদেরা অতিমাত্রায় অবজ্ঞা করেন তা হলো – অর্থনীতির গতিময় (dynamic) বিবর্তন। ... জীবনের বিষয়াদি

[২৯] বিস্তারিত দেখুন, Fritjof Capra. 1988, The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. পৃ. ১৫-১৬, ১৮৮-১৯১

খণ্ডিত করার এবং পৃথক কামরাভুক্ত বা গণ্ডিবদ্ধ করার কারণে তাত্ত্বিক সমস্যার গাণিতিক সমাধানে অর্থনীতিবিদদের আর তেমন কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।... মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত করা হয় না – এ দিক থেকে অর্থনীতিবিদেরা এতকাল পর্বতসম ব্যর্থ চর্চা করেছেন।"[৩০]

অর্থনীতিশাস্ত্রে দুজন মার্কসের কথা বলা হয়। প্রথম মার্কস হলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) "যিনি পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা প্রমাণ করেছিলেন", আর দ্বিতীয় মার্কস হলেন জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬) যিনি "মৃত্যুঘণ্টা থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচানোর পথ দেখিয়েছিলেন"। কেইনস্ ১৯৩৬ সালে লিখলেন "The General Theory of Employment, Interest, and Money", যাকে এডাম স্মিথের 'Wealth of Nations' (১৭৭৬) এবং কার্ল মার্কসের 'Das Capital' (১৮৬৭)-এর সমতুল্য মৌলিক চিন্তা-গ্রন্থ বলা হয়।

বিশ্ব মহামন্দা থেকে পুঁজিবাদ উদ্ধার কাজে বেকার সমস্যার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটনে কেইন্‌স অর্থনীতিশাস্ত্রে নতুন ভাষা সৃষ্টি করলেন। যার অন্যতম হলো: ভোগের আগ্রহ (propensity to consume), নগদ টাকা হাতে রাখার আগ্রহ (liquidity preference), গুণিতক (the multiplier) টাকার সরবরাহ – মিলেমিশে এই চলকগুলো স্থির করে দেয় উৎপাদন আর কর্মনিয়োগের মাত্রা এবং সেই সাথে মূল্যমানের উপরও প্রভাব ফেলে। পুরনো তত্ত্ব অনুসারে সুদের হারটাই সঞ্চয় আর বিনেয়োগের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করে আর মজুরি কমিয়ে পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু কেইন্‌সের "জেনারেল থিওরিতে" যে প্রস্তাব তা ছিল এ তত্ত্বের একেবারে উল্টো। কেইনস্ চেয়েছিলেন আয় বণ্টনে অধিক সমতা এবং দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অনুপার্জিত আয়ের উপরে বাধা নিষেধ। কেইন্‌সের ধারণায় সবার জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর সামাজিক শৃংখলা অর্জন পরস্পরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রশ্ন হলো পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সেটা কি সম্ভব? মনে রাখা দরকার – কেইনস্ এসব কথা বলেছেন এখন থেকে আশি বছর আগে যখনও তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি, দেখেননি স্নায়ুযুদ্ধ, দেখেননি নব্য-উদারবাদী মতবাদের 'নগ্ন দর্শন', দেখেননি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিশ্বব্যাপী মাতম। এখন তো নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এবং পল ক্রুগম্যান পুঁজিবাদের আওতায় এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসমতা-বৈষম্য বাড়ছে এবং মার্কিন রাজনৈতিক সিস্টেম বিত্তকাঠামোর উপরতলার ১ শতাংশ ধনীদের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।... বাজারের ক্ষমতা প্রবল, কিন্তু উদ্ভবসূত্রেই নেই তার কোনো নৈতিক চরিত্র।... তারপরেও বাজার অর্থনীতি এমনকি যখন মোটামুটি স্থিতিশীল, তখনও উচ্চমাত্রার অসমতা সৃষ্টি করে, যার পরিণাম অন্যায্য।... পুঁজিবাদ যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা দিতে পারেনি, আর যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি তা দিয়েছে – অসমতা, পরিবেশ দূষণ, বেকারত্ব এবং (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) মূল্যবোধের এমন অবক্ষয়াবস্থা যেখানে সবকিছুই গ্রহণযোগ্য এবং যেখানে কেউই জবাবদিহি করবে না।... (কিন্তু) শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বলতে যদি বুঝি যে নিচের শ্রেণির উপরের শ্রেণিতে উঠবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে সেক্ষেত্রে আজকের আমেরিকা পুরাতন ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি শ্রেণিভিত্তিক সমাজ।"[৩১]

অর্থনীতিশাস্ত্র গত পাঁচ শত বছর যাবৎ যেভাবে এগিয়েছে এবং যা পেরেছে ও পারেনি তা থেকে বুঝা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা বলা যায় এ শাস্ত্র জনকল্যাণ করার কথা ভাবেনি অথবা বলা যায় এ শাস্ত্রে 'জনকল্যাণ' বিষয়টি লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষ্য হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোনো কিছু করতে গিয়ে 'জনকল্যাণ' এসে পড়েছে মাত্র। এমনটি কেন হলো **এ নিয়ে ইতোমধ্যে বলেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে 'নব্য-উদারবাদ'-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে আরো বলার চেষ্টা করেছি। তবে এতক্ষণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে ইতোমধ্যে যা বলেছি তার সাথে এখানে বলা উচিত হবে যে "অর্থনীতিশাস্ত্র ব্যর্থ" হয়েছে** (failure of economics)। **এ ব্যর্থতা তিন ধরনের:**

১. *বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা (Intellectual failure):* মূলধারার অর্থশাস্ত্রে যে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা তার প্রধান উৎস হলো এ বিশ্বাস যে শেষ পর্যন্ত "বাজার নিজেই নিজেকে সংশোধন করে" অথবা "বাজারই সে ফিল্টার যা দিয়ে সবকিছু সংশোধিত হয়ে যায়" অথবা "বাজারের অদৃশ্য হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব সমস্যার সমাধান করে দেয়"

[৩০] বিস্তারিত দেখুন, Fritjof Capra. 1988. The Turing Point: Science, Society and the Rising Culture. পৃ. ১৮৮-২৬২।

[৩১] দেখুন, Joseph Stiglitz, 2013. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future. London: Penguin Books, পৃ. xxxix, xliii, l, xlvi. আর "মানুষে মানুষে অসাম্য কেন হয়, কীভাবে হয়, হলে কী হয়? আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তবতা"– এ নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ১৬১-১৭৫।

(যাকে বলে "markets are self-correcting")। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যা নিয়ে তেমন ভাবনা নেই বললেই চলে। তা হলো 'অর্থনীতি' বললেই প্রায়ই 'বাজার'কে নির্দেশ করা হয়; অথচ ধারণা হিসেবে 'বাজার'-এর তুলনায় 'অর্থনীতি' অনেক ব্যাপক, গভীর ও জটিল বিষয়। প্রচলিত শাস্ত্রে এ অবস্থা শাস্ত্রের দৈন্যদশারই পরিচয় বহন করে। যেহেতু 'অর্থনীতি' আর 'বাজার'-এ দুটি ধারণাকে প্রায় সবাই সমার্থক মনে করেন (যা আসলে নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রের কথা) আর যেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রে "বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার" এটাই অন্যতম উৎস, সেহেতু বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ দরকার (আসলে ভ্রান্ত ধারণাটি ভেঙ্গে ফেলা দরকার)। নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রীদের মতে অর্থনীতি (যে কোনো দেশের যে কোনো কালের) হলো "বহু ধরনের বিনিময় সম্পর্কের সমাহার" (যাকে বলে web of exchange relationships), যেখানে একক ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য কেনেন, যা অনেক কোম্পানিতে উৎপাদিত হয় তবে তিনি তার শ্রম বিক্রি করেন একটি কোম্পানিতে; আর কোম্পানিরা কেনাবেচা করে অনেক ব্যক্তির ও অনেক কোম্পানির সাথে। এখান থেকেই বলা হয় "অর্থনীতি" মানেই 'বাজার'। আসলে এ কথা ভ্রান্ত। আসলে 'বাজার' হলো অর্থনীতিকে সংগঠিত করার অনেক পথ-পদ্ধতির একটি মাত্র। কারণ কোম্পানির অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই কোম্পানির ভেতরেই ঘটে থাকে (যাকে বলে through internal directives); অর্থনীতির বড় এক অংশের উপর সরকারের প্রভাব আছে আর অনেক ক্ষেত্রে সরকার তা নিয়ন্ত্রণও করে; সরকারসহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) বাজার সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বানিয়ে বাজারের পরিধি নির্ণয় করে দেয়। আর অর্থনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদী স্কুলের প্রবক্তা হার্বাট সাইমন হিসেবপত্তর কষে দেখিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের মাত্র ২০ শতাংশ 'বাজারের' মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সুতরাং 'অর্থনীতি' মানেই 'বাজার' অথবা 'বাজার'ই 'অর্থনীতি' – এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

২. ***নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা*** *(Moral failure)*: নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট এ ব্যর্থতার প্রধান উৎস হলো "অর্থ অথবা টাকার জোরভিত্তিক সিস্টেম" অর্থাৎ যাকে বলা হয় "অর্থ-পূজাভিত্তিক সিস্টেম"-এ বিশ্বাস। বিষয়টি জন্ মেইনার্ড কেইনস্ বলেছিলেন এভাবে: "বস্তুজাগতিক প্রগতি ঐ বিন্দু পর্যন্তই মানবকল্যাণ (মানবসমৃদ্ধি) বাড়াবে, যখন তা নৈতিক-বস্তুর সংখ্যা কমাতে থাকবে" ("Material progress will increase the welfare of the universe upto the point when it starts to diminish the quantity of ethical goods")। অর্থশাস্ত্রে নীতি-নৈতিকতা-সংশ্লিষ্ট ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যই "প্রবৃদ্ধি পূজা" করছি, "ভালো জীবনের" জন্য নয় (not for good life)। এ ব্যর্থতা ঘটছে এ কারণে যে "অর্থনৈতিক জীবনসমৃদ্ধি" বললে আমরা বুঝি শুধু কিছু বস্তুগত পণ্যের সমাহার মাত্র। এ ব্যর্থতার মূলে হলো "বস্তুগত প্রগতির" সাথে "নৈতিক-প্রগতির" সম্পর্ক না বুঝা অথবা মনে করা যে "বস্তুগত জীবনমান উন্নয়ন" হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই "নৈতিক-মূল্যবোধগত উন্নতিও" হয়ে যাবে। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র এসব দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে; আর উপযোগবাদ তা বাড়িয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়টিই অবলুপ্ত প্রায়।

৩. ***প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা*** *(Institutional failure)*: আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানই "ফলপ্রদ বাজার তত্ত্বে" বিশ্বাস করে বসে আছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী তারা মনে করেন যে আর্থিক বাজার লাগাতারভাবে সম্পদের ভ্রান্ত-মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না এবং সে কারণেই অর্থবাজারকে তেমন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন নেই। এ ব্যর্থতার সাথে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যর্থতার সম্পর্ক আছে।

সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্র এখন তিন ধরনের ব্যর্থতা নিয়ে এগুনোর চেষ্টা করছে: বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। বাজারের শক্তিতে অতি বিশ্বাস অথবা নির্বিচার বিশ্বাস এবং অনৈতিক অর্থ-পূজা সম্ভবত এ দুটো থেকেই এ তিন ব্যর্থতার সৃষ্টি। মানুষের জীবনসমৃদ্ধি এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে অর্থনীতিশাস্ত্রকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা, নীতি-নৈতিকতার ব্যর্থতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এসবের কারণ-পরিণাম নিয়ে নির্মোহভাবে ভাবতে হবে। অর্থনীতিশাস্ত্রকে এ তিন ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

অধ্যায় ৫

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদঃ সাম্রাজ্যবাদী সেবাদাসত্বের 'নগ্ন দর্শন'

"বড় পর্দায় বিষয়বস্তু সঠিকভাবে বুঝতে হলে সত্যের একটি ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে মানসিকভাবে হতাশ এবং মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই ভয় থাকা উচিত।"

হুনজি, খৃ.পূ. ৩১২-২৩০

অর্থনীতিশাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদটি (Neo-liberalism or Neo-liberal doctrine) আসলে অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের (যাঁদের অন্যতম এডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো) অবাধবাজার বা মুক্তবাজার মতবাদের (Laissez faire doctrine) আধুনিক সংস্করণ মাত্র। তবে এই নব্য-উদারবাদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী, অনেক বেশি আধিপত্যবাদী। নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদের কার্যকর প্রারম্ভকাল ১৯৬০-এর দিকে হলেও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তা নিয়ামক রূপ নিয়েছে ১৯৮০-র দিক থেকে।

অর্থনীতিশাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণে শুরুতেই মনে রাখতে হবে যে তাদের প্রধান পূর্বসূরী এডাম স্মিথ যখন ১৭৭৬ সালের দিকে তাঁর "বাজারের অদৃশ্য হাত" নিয়ে খেলছেন, তখন সেটা ছিল বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের সবে শুরুর দিক – পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো সবে গড়ে উঠছে; আর নব্য-উদারবাদী মতবাদওয়ালারা যখন মুক্তবাজার নিয়ে খেলতে উম্মত্ত, তখন পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ শিখর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে দুটো বিশ্বযুদ্ধ পার করেছে, – দুই মেরুর বিশ্ব (পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র) এক মেরুর পুঁজিবাদী বিশ্বে রূপান্তরিত হয়েছে, – বৃটিশ আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে মার্কিন আধিপত্যের যুগের চার দশক পার করে সাম্রাজ্যবাদের মূল ভরকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বের চার মৌল-কৌশলিক সম্পদে (জমি, জল, জ্বালানি-খনিজ, আকাশ-মহাকাশ) নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছে, – এবং এ প্রক্রিয়ায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ধনী দেশসমূহের আঁতাত গড়ে তুলেছে এবং পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার অশুভ ত্রিভুজীয় আঁতাতের[৩২] মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির ধারণা হিসেবে উদারবাদের স্বীকৃতি ও খ্যাতির শুরুটা ১৭৭৬ সালে যখন স্কটল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ তাঁর "The Wealth of Nations" পুস্তকে ফর্দ দিলেন যে জাতির সম্পদ বাড়াতে চাইলে যা যা করতেই হবে তা হলো প্রধানত এ রকম:

১. সরকারের পক্ষ থেকে বাজার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নাক-গলানো (intervention অর্থে) কমিয়ে ফেলতে হবে;

২. বাজারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ সর্বনিম্ন মাত্রায় নিয়ে আসতে হবে;

৩. বাণিজ্য হতে হবে অবাধ, মুক্ত;

৪. কোনো শুল্ক রাখা চলবে না (no tariffs);

৫. বাণিজ্যে কোনো ধরনের বাধা (no barriers) রাখা চলবে না;

---

[৩২] নয়া উদারবাদীদের এই অশুভ ত্রিভুজীয় আঁতাত আসলে কী করে, তা কোন উদ্দেশ্যে কীভাবে কাজ করে, কীভাবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে, কীভাবে তা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে 'মূলা' দেখিয়ে নব্য-উদারবাদী নীতি গ্রহণে বাধ্য করে, কী তার পরিণাম প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, Ha-Joon Chang. 2008. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, পৃ. ১৩-১৮, ২৩, ৩২-৩৬, ৮৭, ৮৮, ১৪৫-১৪৯, ১৫৬-১৫৭।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে হবে (no controls);

৭. দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই – "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market) সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবে।

আগেই বলেছি আজকের নব্য-উদারবাদ অষ্টাদশ শতকের এই ধ্রুপদী উদারবাদেরই নবতর রূপ তবে তা ঐ উদারবাদের চেয়ে বহুগুণ আগ্রাসী; এক কথায় আধিপত্যবাদী। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতির তাত্ত্বিকেরা বলেন যে 'বাজার' (market) হলো 'প্রাকৃতিক' (natural) বিষয়, "বাজার শুরু থেকেই ছিল" – তাদের ভাষায় "In the beginning, there were markets" (একে বলে market primacy assumption) এবং বলেন 'বাজার' মানেই 'অর্থনীতি'। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের চিন্তার দারিদ্র্য এখানেও যা সমাজ বিকাশের বিশ্লেষণে আগেই দেখিয়েছি যে 'বাজার' 'প্রাকৃতিক নয়', বাজার শুরু থেকেই ছিল না – বাজার এসেছে বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে; 'বাজার' মানেই অর্থনীতি অথবা 'অর্থনীতি' মানেই 'বাজার' নয়, এবং 'বাজার' সব ঠিক করে দেবে – এ কথা ঠিক হলে "বাজার ব্যর্থতা" (market failure) কেন আর কেনই বা 'রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ' (state অথবা government intervention) – তা কম অথবা বেশি যাই হোক না কেন?

আসলে আজকের নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রীয় মতবাদের সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট লক্ষ্য আছে। লক্ষ্যটি এ রকম: সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ফর্দ দেয়া, আর সেই ফর্দ তাদেরই সৃষ্ট বৈশ্বিক-আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থাসহ সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়ন করা।

নব্য-উদারবাদী মতবাদ মোটামুটি গত চল্লিশ বছর ধরে নিরন্তর বলে যাচ্ছে – যদি অর্থনৈতিক উন্নতি চাও এবং দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা কমাতে চাও তাহলে যা যা করতে হবে তা হলো এ রকম: মুক্তবাজার-অবাধবাজার-বাধাহীনবাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না, বাজার ছাড়া কারো কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না; সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দাও (complete privatization); রাষ্ট্রকে 'নৈশপ্রহরীর' (night watchman) চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না; সরকারকে যদি একটু-আধটু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তা হতে হবে সাময়িক এবং পরে তা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছেড়ে দিতে হবে। আর নব্য-উদারবাদের এসবই হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' (Washington Consensus)-এর মতাদর্শিক ভিত্তি। বৈশ্বিক পর্যায়ে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা উদ্দিষ্ট এ ঐকমত্যের উদ্‌গাতা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর সাথে আছে অশুভ ত্রিরত্ন – আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক (The World Bank), বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) এবং সেইসাথে আছে সংশ্লিষ্ট 'থিংক ট্যাংক'সমূহ। যৌথ নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে তারা বিশ্বব্যাপী নব্য-উদারবাদ নির্দেশিত 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'-ভিত্তিক সংস্কার কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করার জন্য যে দেশকে যেখানে, যে সময়ে, যতদূর চাপ প্রয়োগ সম্ভব তা তারা নির্দ্বিধায় করে থাকে। এই ওয়াশিংটন ঐকমত্য প্রধানত জন উইলিয়ামসন প্রস্তাবিত[৩৩] দশটি নীতি-কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঐ নীতি-কৌশলের সারবস্তু নিম্নরূপ:

১. আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে মূল ফর্দ হলো সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি রাখা যাবে না। কারণ সরকারি ব্যয়ে বড় মাপের ঘাটতি পুঞ্জিভূত হতে থাকলে তা মূল্যস্ফীতি বাড়াবে, কমাবে উৎপাদনশীলতা। তবে সরকারি ঘাটতি ব্যবস্থা শুধু অর্থনীতিতে সাময়িক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. সরকারি ভর্তুকি এমন এক অপচয়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয় এবং দরিদ্রদের জন্য কল্যাণকর নয়।

৩. কর কাঠামো সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একদিকে করের ভিত্তি (tax base) সম্প্রসারণ করতে হবে আর অন্যদিকে সৃজনশীল উদ্যোগ (innovation) ও কাজের ফলপ্রদতা (efficiency) বাড়াতে প্রান্তিক কর হার নমনীয় করতে হবে।

৪. বাজার হবে সুদের হারের একমাত্র নির্ধারক এবং সে হার হবে ধনাত্মক তবে প্রকৃত হিসেবে নমনীয় (moderate অর্থে)।

৫. অর্থের বিনিময় হার হতে হবে ফ্লোটিং বা ভাসমান।

[৩৩] বিস্তারিত দেখুন, Williamson., John. 1990. "What Washington Means by Policy Reform". In John Williamson, (ed). *Latin American Adjustment: How much Has Happened?* Washington, DC: Institute for International Economics.

৬. বাণিজ্য হতে হবে সম্পূর্ণ উদারিকৃত অর্থাৎ আমদানি উদারীকরণে সবধরনের পরিমাণগত বাধা অপসারণ করতে হবে; বাণিজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রার এবং অপেক্ষাকৃত সমতামুখী শুল্ক (বা ট্যারিফ) থাকতে হবে – ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে।

৭. ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে 'পুঁজি হিসাব' (capital account) উদারীকরণ করতে হবে যার, ফলে এক দেশ থেকে যেন অন্য দেশে বিনিয়োগ প্রবাহ আকর্ষিত হয় এবং বিদেশে অবস্থানরত পুঁজি যেন স্বদেশে বিনিয়োগ হতে পারে।

৮. সব রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোক্তা-শিল্প প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীকরণ করে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। এসবে যে ক্ষেত্রে সরকার ফলপ্রদ ও ফলপ্রসূ ফল দেখাতে পারে না (যেমন টেলিযোগাযোগ) তা বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

৯. বাজারে অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী অথবা যা কিছু প্রতিযোগিতা-প্রতিবন্ধক সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণমুক্ত (deregulation) করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক কয়েকটি ক্ষেত্র সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতে পারে, যেমন নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, পরিবেশ ও ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নজরদারি ইত্যাদি।

১০. ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা-অধিকারের আইনগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

আসলে এতসব হবে-হতে হবে-দিতে হবে-করতে হবে – এসব বলে নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি মতবাদ-উদ্ভূত ফর্দ দিয়ে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' চাচ্ছেটা কী? চাওয়াটা ঐকমত্যের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট। আর তা হলো যখন দুই মেরুর বিশ্ব ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদের মূল কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইতো বিশ্বের চারটি বৃহৎবর্গের মৌল-কৌশলিক সম্পদের (key strategic resources) উপর অভিগম্যতা (access)- যেগুলি হলো (১) জমি সম্পদ (land resources), (২) জল সম্পদ (water resources), (৩) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (fuel, energy, mineral resources), এবং (৪) মহাকাশ-মহাশূন্য (space)। আর এখন এক মেরুর বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের মূল হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এই চার মৌল-কৌশলিক সম্পদের উপর অভিগম্যতা নিয়ে আদৌ সন্তুষ্ট নয়, তারা চায় ঐ চার সম্পদের উপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ (absolute ownership and control)। আর এসব নিশ্চয়ই বিশ্বের আপামর তাবৎ মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বিমোচনের লক্ষ্যে নয়, গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে যাকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন 'Of the 1%, for the 1%, by the 1%'।[৩৪]

অনেকেরই মতে নব্য-উদারবাদ এখন "আজকের বিশ্বের চেহারা বিনির্মাণে নির্ধারক মতাদর্শ এবং আমরা নব্য-উদারবাদের যুগে বাস করছি"।[৩৫] কেউ কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ প্রধানত "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রায়োগিক এক তত্ত্ব, যা অনুযায়ী মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি (human well-being) সবচেয়ে ভালভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব যদি ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা-সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা ও দক্ষতার মুক্তি নিশ্চিত করতে এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ করা যায় যেখানে থাকবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মালিকানা সুরক্ষার কার্যকর নিশ্চয়তা, মুক্তবাজার এবং অবাধ বাণিজ্য। আর রাষ্ট্রের কাজ হবে এসব কাজ সুচারুরূপে প্রতিপালন-উদ্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ ও লালন করা।"[৩৬] আবার কেউ বলছেন নব্য-উদারবাদ হলো "এক রাজনৈতিক দর্শন যেখানে সবচেয়ে অগ্রাধিকারের বিষয় হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের উপর অধিকার।"[৩৭] আর এসব বলতে বলতে নব্য-উদারবাদীদের কেউ কেউ এমন অবস্থানে পৌঁছে যান যখন বলেন পুরোপুরি "বিশুদ্ধ" মুক্তবাজার চাই এবং তা নিশ্চিত করতে হলে সরকার ব্যবস্থাকেই বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে – এটা হলো 'নৈরাজ্যবাদী-উদারবাদ' (anarcho-liberalism)।

নব্য-উদারবাদই মহৌষধ – এটি প্রমাণে কারো কারো যুক্তি হলো এ রকম: "উদ্ভবসূত্রে মানব সমাজে মানুষের যে সৃজনশীল সুপ্ত প্রতিভা এবং উদ্যোগ গ্রহণের স্পৃহা আছে তা অবমুক্ত করার একমাত্র মাধ্যম হলো মুক্তবাজার ও অবাধ

---

[৩৪] Stightz Joseph.E, 2013. The Price of Inequality. পৃ. xlvi.

[৩৫] Saad-Filho, Alfred and Deborah Johnston. 2005. "Introduction", পৃ. ১-৬ in Alfredo Saad-Filho and Alfredo Deborah Johnston. 2005. Neoliberalism – A Critical Reader.

[৩৬] Harvey, David, 2005. A Brief History of Neoliberalism.

[৩৭] Blomgren, Anna-Maria. 1997. Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F.A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

বাণিজ্য। আর এ মাধ্যম ব্যবহার করলে মানুষের মুক্তি ও জীবন-সমৃদ্ধি উভয়ই বাড়বে এবং সেই সাথে সম্প্রসারিত হবে সম্পদ বিনিয়োগের সবচেয়ে ফলপ্রদ ব্যবস্থা।"[৩৮]

তাহলে এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় নব্য-উদারবাদ যা চাচ্ছে পরিণামসহ তা হলো এ রকম:

১. বাজারই হবে শাসক (rule of the market) এবং অনিয়ন্ত্রিত-মুক্তবাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, যা শেষ পর্যন্ত সবার জন্য মঙ্গলজনক হবে। ব্যাপারটা আমার মতে, অনেকটা প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগান সাহেবের "সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস" এবং "ট্রিকল ডাউন ইকনমিকস" (চুইয়ে পড়া সুবিধের তত্ত্বনীতি)-এর মতো। অবশ্য দুটিই ইতোমধ্যে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

২. সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয় কমাতে হবে এবং এমনকি দরিদ্রদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনি আছে সেসব কমিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে তা বাতিল করতে হবে। তাদের যুক্তি – এসব করলে নিজেই নিজেকে দেখার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে মানুষের মধ্যে উদ্যোগ-উদ্দীপনা বাড়বে এবং মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে, যা একপর্যায়ে সামাজিক খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেবে।

৩. সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনতে হবে। তাদের যুক্তি – সব কিছুতেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনলে মুনাফা বাড়বে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে কাজে লাগবে, পরিবেশ উন্নততর করতে সহায়ক হবে এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বাড়বে।

৪. সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রের মালিকানায় যা কিছু আছে (দু-একটি বিষয় বাদে) সবকিছু বিরাষ্ট্রীয়করণ করে ব্যক্তিমালিকানায় (privatization) ছেড়ে দিতে হবে। তাদের পরামর্শ হলো ব্যাংক, শিল্প-কারখানা, রেল, হাইওয়ে, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, স্কুল, হাসপাতাল, এমনকি সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও ল্যাট্রিন এসবই বিরাষ্ট্রীয়করণ করে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আগেই বলেছি এসবের ফলাফল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো অর্থেই মঙ্গলজনক হবে না। এসবের নিট ফল আসলে ইতোমধ্যে যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তা হলো একদিকে জাতীয় সম্পদ গুটিকয়েক মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হবে আর অন্যদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনকার চেয়ে অধিকতর দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার শিকারে পরিণত হবে।

৫. "পাবলিক গুডস" এবং "কম্যুনিটি" – এসব ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে এবং এসব ধারণাকে "ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব" হিসেবে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আর তাই যদি হয় তাহলে এসবের পরিণতি হবে মারাত্মক – দরিদ্র মানুষকে তার সন্তানের শিক্ষা, তার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব এবং সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদেরকেই নিতে হবে; এবং দরিদ্র মানুষ যদি এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে তাদের 'অলস' বলে দোষ দেয়া হবে। আসলে এসব এক্সপেরিমেন্ট বা পরীক্ষা-নীরিক্ষা ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশে হয়েছে এবং তার সুস্পষ্ট প্রভাব-অভিঘাত যা দেখা গেছে তা হলো এ রকম: নয়া-উদারবাদ মানে "ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া-উপনিবেশবাদ"; নয়া-উদারবাদ মানে "ইউরোপে মহামন্দার পূর্বাভাস", নয়া-উদারবাদ মানে "এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে জাতীয় সম্পদের লুটপাট"; নয়া-উদারবাদ মানে "আফ্রিকায় পেছন দিকে হাঁটা" ইত্যাদি।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্র মানুষের দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার – ধার ধারে না। শুধু তা-ই নয় নব্য-উদারবাদ মনে করে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা যে কোনো দেশের উন্নয়নেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে, উন্নয়ন চাইলে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা চাইতে হবে। এ বিষয়ে নব্য-উদারবাদের বিশ্বগুরু নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান তো কোনো ধরনের রাখঢাক না করেই বলেছেন – মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য-অসমতা নিয়ে আমাদের ভাবনার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আর এর পিছনে তিনি যুক্তি দিয়েছেন:

১. অর্থনীতিকে ভালভাবে কাজ করতে হলে সত্যিকার অর্থে একটা পর্যায়ের বৈষম্য-অসমতা কাম্য;

---

[৩৮] Hayek, Friedrich A. 1973. Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles and Political Economy. Volume 1: Rules and Order; Murray ([1962/1970] 2004. Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles- Power and Market: Government and the Economy. [Two books republished in one file.] Auburn, Alabama: the Ludwig von Mises Institute. http/www.mises.org/rothbard/mespm.PDF.

২. যেভাবেই দেখা হোক না কেন, মুক্তবাজার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সিস্টেমে একটা পর্যায়ে বৈষম্য-অসমতা থাকবেই – তা এড়ানো যাবে না (unavoidable অর্থে); এবং

৩. বাজার অর্থনীতিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য-অসমতা নন-মার্কেট অর্থনীতির চেয়ে কম।[৩৯] মিল্টন ফ্রিডম্যান এসব বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে আরো যা বলছেন তা শুনলে যেকোনো সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ নিমেষেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন। তিনি বলছেন – "আমি মাদক-নেশাজাতীয় দ্রব্য পণ্যাদির বৈধকরণের পক্ষে। আমি যে মূল্যবোধ সিস্টেম ধারণ করি তা অনুযায়ী কোনো মানুষ যদি নিজে নিজেকে হত্যা করতে চায় সে অধিকার তার থাকতে হবে, সে অধিকার তাকে দিতে হবে। নেশা-মাদকজাতীয় দ্রব্যাদি থেকে যে ক্ষতি হয় তার প্রধান কারণ ঐসব দ্রব্যাদির বেচাকেনা অবৈধ"।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি দর্শন, সে দর্শনের প্রয়োগফল এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণায় অনেক নির্মোহ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় যা যা প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নিম্নরূপ:[৪০]

১. নব্য-উদারবাদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নব্য উদারবাদের প্রবক্তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যদি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ না করে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং যদি রাষ্ট্রকে নেহায়েতই 'নৈশপ্রহরীতে' (night watchman) রূপান্তরিত করা হয় তাহলে অর্থনীতিতে অসমতা বৃদ্ধিসহ অধিকতর অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং বেশ কিছু অপ্রিয় বিষয়াদি আপাতত ঘটলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হবে, এবং দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদে বৈষম্য-অসমতা-অস্থিতিশীলতা কমাবে (এখানে তাদের যুক্তি হলো: সম্পদ পুনর্বণ্টনের আগে সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, যা সৃষ্টিতে সহায়ক হলো দ্রুত প্রবৃদ্ধি)। আসলে এসব ঘটেনি। যেমন "খারাপ পুরনো দিনে" ১৯৬০-১৯৮০ সময়কালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩.১ শতাংশ হারে, আর নয়া উদারবাদের যুগে ১৯৮০-২০০০ সময়কালে ঐ হার ২ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে মানুষের মাথাপিছু আয় হার ৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশে। আর এই হ্রাসপ্রাপ্ত ১.৫ শতাংশ মাথাপিছু আয় আরও কমে ১ শতাংশে দাঁড়াবে যদি এ হিসেব থেকে চীন ও ভারতের অর্থনীতিকে বাদ দেয়া হয় যারা ঐ সময়ে নব্য-উদারবাদী নীতি গ্রহণ করেনি। শুধু তা-ই নয় নয়া-উদারবাদের যুগে, ১৯৮০-২০০০ সময়কালে ল্যাতিন আমেরিকায় মাথাপিছু আয়ের কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটেনি; সাব-সাহারান আফ্রিকায় তা হ্রাস পেয়েছে, আর প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে তা সমাজতন্ত্রের পতনের আগের তুলনায় অর্ধেক বা তার নিচে নেমে এসেছে।

২. নব্য-উদারবাদ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশে দেশে বৈষম্য-অসমতা প্রকট থেকে প্রকটতর করেছে।

৩. উন্নয়নশীল বহু দেশে নব্য-উদারবাদের যুগে দারিদ্র্য বেড়েছে।

৪. নব্য-উদারবাদ গণতন্ত্র বিকাশে সহায়ক নয় বরঞ্চ বিভিন্ন দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৫. নব্য-উদারবাদী দর্শনের প্রয়োগে ১৯৯০ দশকের প্রবৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক উপকৃত হননি।

---

[৩৯] Milton Friedman. 1962. Capitalism and Freedom; Milton and Rose D. Friedman. 1980. *Free to Choose*.

[৪০] নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি দর্শন ও তার ঋণাত্মক প্রয়োগফল সম্পর্কে এখানে যা বলা হলো সে সম্পর্কে গবেষণালব্ধ বিস্তারিত ফলাফলের জন্য দেখুন: Kozul-Wright, K and P. Rayment. 2007. The Resistible Rise of Market Fundamentalism. Rethinking Development Policy in an Unbalanced World; Milberg, W and D. Winkler. 2013. Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development; Deane, P. 1989. The State and the Economic System; Schumpter, J. 1987. Capitalism, Socialism and Democracy; Stiglitz, J. 2002. Globalization and Its Discontents; Basu, K. 2000. A Prelude to Political Economy; Buchanan. J. 1975. Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan; Evans, P. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation; Mazzucato, M. 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Public *vs*. Private Sector Myths; Stiglitz, J. 2006. Making Globalization Work; Rodrik, D. 2011. The Globalization Pardox; Chang, Ha-Joon. 2003. Globalisation, Economic Development and the Role of the State; Chang, Ha-Joon. 2008. Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism; Chang, Ha-Joon and Ilene Gabriel. 2005. Reclaiming Development. An Alternative Economic Policy Manual (পৃ. ১৬-২০, ২২-২৩, ৩৪-৩৬, ৪৩-৪৫, ৬০-৬৬, ৭৪, ৮৫-৮৮, ৯৪-৯৯, ১১২-১১৩, ১১৬-১২০, ১২৫-১২৬, ১৪৩-১৪৪, ১৫৩-১৫৭, ১৬৮-১৭৭, ১৮০, ১৮২-১৮৬, ১৯০-১৯৬)।

৬. নব্য-উদারবাদ কর্পোরেট দুর্নীতি বৃদ্ধির কারণ।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নব্য-উদারবাদের অ্যাংলো আমেরিকান মডেলের বিপরীতে পূর্ব এশিয়ার মডেল ভাল ফল দিয়েছে; নব্য-উদারবাদী অ্যাংলো-আমেরিকান মডেল সার্বজনীন নয়।

৮. নব্য-উদারবাদী দর্শনের বিপরীতে পৃথিবীর অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছে।

৯. নব্য-উদারবাদী অবাধ বাণিজ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য সবচেয়ে কাম্য-অনুকূল নয় অর্থাৎ অপটিমাল নয় বিশেষত যখন তারা শিল্পোন্নত দেশের সাথে বাণিজ্য করে।

১০. মুক্ত-অবাধ বাণিজ্য সে পথ নয় যে পথে আজকের শিল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নত হয়েছে।

১১. নব্য-উদারবাদের ধারণা যে অধিকতর অবাধ-মুক্তবাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ায় – এ যুক্তি দুর্বল।

১২. বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে যে বিচ্যুতি ঘটে তা নব্য-উদারবাদের প্রবক্তারা এ নিয়ে যা বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক; নব্য-উদারবাদী ধারণার বিপরীতে অনেক অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে যা সিলেকটিভ শিল্প উন্নয়ন নীতি সহায়ক।

১৩. নব্য-উদারবাদীদের এ ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকেরা তাদের সমধর্মী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের চেয়ে কম ফলপ্রদ এবং বেশি অদক্ষ।

১৪. নব্য-উদারবাদের এ ধারণা ভ্রান্ত যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধি সহায়ক নয়।

১৫. নব্য-উদারবাদের ধারণা যে প্যাটেন্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা নতুন নতুন অভিজ্ঞান সৃষ্টির সহায়ক – এ ধারণা ভ্রান্ত। শিল্পোন্নত দেশের উন্নয়নে আসলে প্যাটেন্ট-এর কোনো ভূমিকা ছিল না।

১৬. নব্য-উদারবাদের মেধাস্বত্ব (intellectual property right) বিষয়টি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ক্ষতিকর ও ব্যয়বহুল ব্যাপার।

১৭. নব্য-উদারবাদের আন্তর্জাতিক পুঁজি প্রবাহের উদারীকরণ প্রস্তাব যুক্তিতে টেকে না।

১৮. আন্তর্জাতিক ব্যাংক ঋণ অনেক দেশেই আর্থিক ভঙ্গুরতার কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯. বৈদেশিক ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ বিষয়টি মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে; নব্য-উদারবাদের প্রস্তাবিত অনিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও বিনিয়োগ উন্নয়ন সহায়ক নয় এবং তা নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে।

২০. বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বহুজাতিক কর্পোরেশনের উপস্থিতি উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক ধরনের বিপর্যয়কর সমস্যার কারণ।

২১. নীতিনির্ধারকদের জানতে হবে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের ভিতরের পুঁজির ব্যাপকাংশ উল্টোপথে বিদেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

২২. দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিকব্যবস্থার উদারীকরণ অনেক উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন-ব্যর্থতার কারণ হয়েছে।

২৩. নব্য-উদারবাদীরা আর্থিক সিস্টেমের উদারীকরণের যে কথা বলেন তা প্রায়শই "ফটকা-অনুমানভিত্তিক উন্নয়নের" ('speculation-led development') কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাজনিত (কারেন্সি) এবং ব্যাংকিং সংকট (ক্রাইসিস) ঘটে, যা আবার আয় বৈষম্য বাড়ায় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোর বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং আর্থিক ভঙ্গুরতা বাড়ায়; নব্য-উদারবাদীরা যে বলেন "পুঁজির বাজারভিত্তিক বরাদ্দ" বিনিয়োগ বাড়ানোর এবং অদক্ষতা, অফলপ্রদতা, অপচয় ও দুর্নীতি রোধের শ্রেষ্ঠ উপায় – এসব কথা সঠিক নয়।

২৪. উদারীকরণকৃত আর্থিক প্রণালী বা সিস্টেম বেশির ভাগ দেশেই উন্নয়ন-সাফল্যের অংশ ছিল না।

২৫. নব্য-উদারবাদের ফর্দ "অনিয়ন্ত্রিত কারেন্সি কনভার্টেবিলিটি" – কারেন্সি অবচিতি এবং সংশ্লিষ্ট বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তা পুঁজি পাচার এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

২৬. নব্য-উদারবাদের ফর্দ যে উন্নয়নশীল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের বাইরে স্বাধীন সত্তা হতে হবে – এ তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা মূল্যস্ফীতি রোধে ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখেনি।

২৭. নব্য-উদারবাদীদের মূল্যস্ফীতি-সংক্রান্ত পরামর্শ ভুল পরামর্শ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ঐ পরামর্শের ফলে এমন মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হয়েছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে পিছনে টেনে ধরেছে।

২৮. নব্য-উদারবাদীদের পরামর্শে বাজেটে যে বরাদ্দ কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে তার ফল খারাপ হয়েছে, তা জনগণের জীবনমানে ক্ষতির কারণ হয়েছে। তা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করেনি।

২৯. ঐতিহাসিকভাবেই দেখা যায় যে কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান-এর অপেক্ষাকৃত অত্যুচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সে সময়কালে যখন সরকারি (বাজেট) ব্যয় বরাদ্দ ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাজেট ঘাটতিও ছিল বেশি।

৩০. নব্য-উদারবাদীরা সরকারি বরাদ্দের বিপক্ষে অবস্থান করেন। কিন্তু এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ প্রাইভেট বরাদ্দের চেয়ে খারাপও নয় এবং তা ব্যক্তি খাতের বরাদ্দের জন্য বাধাও নয়।

তাহলে যা দাঁড়ালো সেটা এ রকম – নব্য-উদারবাদ আসলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত দর্শন যা কোনো মানদণ্ডেই জনকল্যাণকর নয় – কোনো দেশেই, এবং যা দেশে দেশে রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী[৪১] সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিনির্মিত দর্শন, এবং একই সাথে যা দেশজ রেন্ট সিকিং পদ্ধতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের প্রাণকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ জিইয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র।

অর্থনীতিশাস্ত্রের নব্য-উদারবাদী মতবাদ বলছে 'বিশ্বায়ন' (globalization) – মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্যকে অনিবার্য করে তুলেছে। এ সুযোগ নিতে যারা ব্যর্থ হবে ঐতিহাসিক ব্যর্থতার দায়ভার তাদেরই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা উচিত যে গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন-এর উপযোগিতা নিয়ে বিপরীতমুখী স্পষ্ট দুটো পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম পক্ষ 'globaphiles'-দের অবস্থান বিশ্বায়নের পক্ষে, আর দ্বিতীয় পক্ষ 'globaphobes'-দের (বিশ্বায়নের কথা শুনলে যাদের গায়ে জ্বর ওঠে) অবস্থান বিপক্ষে। মাঝামাঝি আর এক পক্ষ আছে যারা বলার চেষ্টা করেন যে বিশ্বায়ন যেহেতু বাস্তবতা, সেহেতু বিশ্বায়ন কীভাবে সবার জন্য উপকারী হতে পারে তা ভাবা দরকার। মধ্যপক্ষে অবস্থান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ যা বলছেন তা এ রকম: বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তা দারিদ্র্য হ্রাস করছে না; বিশ্বায়ন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধের সাথে বিরোধাত্মক; বিশ্বায়ন গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভূমিকা রাখছে; বিশ্বায়ন গণতন্ত্রকে পাল্টে দিয়ে জাতীয় এলিটদের পুরাতন স্বৈরাচারকে আন্তর্জাতিক অর্থগোষ্ঠীর নতুন স্বৈরাচার দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছে; বিশ্বায়ন-এর ফলে কোটি কোটি মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়েছে; বিশ্বায়ন

[৪১] 'রেন্ট-সিকার' এর মর্মানুবাদ হতে পারে দুর্বৃত্ত, পরজীবী শ্রেণি, অনুপার্জিত আয়কারী, লুটেরা, আত্মসাৎকারী, ফাও-খাওয়া শ্রেণি, ফটকাবাজ গোষ্ঠী ইত্যাদি। রেন্ট সিকিং বিষয়টির ব্যাখ্যাটি এরকম: বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দুভাবে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে– এটা রেন্ট সিকিং নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই রেন্ট সিকিং, আর এসবের সাথে যুক্ত যারা তারাই রেন্ট-সিকার। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত বাড়ায় সেখানে রেন্ট সিকিং এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। রেন্ট সিকিং সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে। রেন্ট সিকিং পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় বিত্তের হস্তান্তর। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এরকম: উপরতলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নীচ তলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে কিন্তু নীচ তলার মানুষ বুঝতেই পারবে না– কীভাবে কী হয়ে গেল! আর রেন্ট সিকিং-এর এই প্রক্রিয়ায় রেন্ট-সিকারদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। রেন্ট সিকিং-এর এ বিষয়টি অর্থনীতির ভাষায় 'zero sum game'ও নয়– এটা প্রকৃত অর্থে 'negative sum game'। বিষয়টি আরো একটু স্পষ্ট করা প্রয়োজন। ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তির স্ব-স্বার্থ (self interest) বিকশিত হবার সুযোগ দিলে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand of market) অন্য সবার জীবনসমৃদ্ধি বাড়াবে। কিন্তু ১৯২৯-৩৩ এর বিশ্ব মহামন্দা আর ২০০৭-০৮ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের পরে এডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত তত্ত্ব' আর কেউ বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– 'অদৃশ্য হাত' এখন অদৃশ্য। নব্য-উদারবাদ হলো এই অদৃশ্য হাতের দৃশ্যমান তত্ত্ব। বাজার ব্যবস্থাটাই এমন যা রেন্ট-সিকার সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; রেন্ট সিকিং সমাজে বৈষম্য-অসমতা সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টি করবে; রেন্ট সিকিং অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা বাড়াবে আর ঐ অস্থিতিশীলতা বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; রেন্ট সিকিং থেকে উদ্ভূত বৈষম্য-অসমতা মানুষের সুযোগের সমতা কমাবে আর সুযোগের অসমতা বৃদ্ধি বিদ্যমান বৈষম্য-অসমতা আরো বাড়াবে; আর পুরো এ প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করবে (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৬,"বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", পৃ. ২৩-৩৪)।

যেভাবে চলছে আর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যেসব নিয়মকানুন বানাচ্ছে তাতে করে সংস্থাটিই এখন বৈশ্বিক অসমতা সৃষ্টি ও ভণ্ডামির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে; বিশ্বায়নের বিধি-বিধান যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে ধনী বিশ্বের (উন্নত বিশ্বের) শিল্পপণ্য গরিব বিশ্বে (উন্নয়নশীল দেশে) অবাধে ঢুকবে অথচ গরিব বিশ্বে উৎপাদিত পণ্য (বস্ত্র-সুতা-কৃষিজাত) অবাধে ধনী বিশ্বে ঢুকতে পারবে না; বিশ্বায়নের আওতায় মেধাস্বত্ব আইন (intellectual property right) আসলে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud)। এসব কারণেই স্টিগলিজ বলছেন, বিশ্বায়ন বাস্তবায়নে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা চলছে (managing globalization অর্থে) তা পরিবর্তিত না হলে উন্নয়ন তো হবেই না বরঞ্চ দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতা বাড়তে থাকবে; প্রয়োজন সেই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শাসকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে সংস্কারে বিশ্বায়নের মানবকল্যাণকামী সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হতে হবে (বলা হচ্ছে 'institute a more humane process of globalization' এর কথা)।[৪২] আর নোয়াম চমস্কি সোজাসুজি বলছেন "বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক বিভাজন সম্প্রসারিত করবে।[৪৩]

বিশ্বায়নের অর্থ যদি উদারীকরণের নামে পুঁজি ও বাণিজ্যের অবাধ বিচরণ হয়, সেক্ষেত্রে সবার চিন্তা উদ্রেকের জন্য 'গ্লোবালাইজেশন' বা বিশ্বায়ন নিয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। এ প্রশ্নটি ধনী বিশ্বের বিশ্বায়ন গুরুরা পছন্দ করেন না; বলা চলে ভয় করেন। বিশ্বায়নের আওতায় এখন পর্যন্ত মোটামুটি বিশ্বায়িত হবার প্রক্রিয়ায় আছে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন (trade globalization)। যেখানে মূল কথা 'movement of goods is a substitute for the movement of people'[৪৪]। পুঁজির অবাধ চলাচল আর সেই সাথে স্বল্প শুল্কের ফলে শিল্প-কারখানাসহ ফার্ম তার শ্রমিককে বলতেই পারে যে যদি আমার শর্তে অর্থাৎ আমার নির্ধারিত স্বল্প মজুরিতে এবং কর্মপরিবেশ যা আছে তা মেনে নিয়ে কাজ না করতে চাও তাহলে আমি আমার কারখানা সরিয়ে ফেলব, প্রয়োজনে অন্য দেশে নিয়ে যাব – অর্থাৎ উন্নত দেশে শ্রমিকের মজুরিসহ কর্মপরিবেশ নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ নেই, আর সে কারণেই ধনী দেশে ট্রেড ইউনিয়ন বলে আসলেই কিছু নেই বললেই চলে। এখন আসা যাক ঐ প্রশ্নে যা ধনী দেশের বিশ্বায়নপন্থীরা ভয় পান। প্রশ্নটি সোজাসাপ্টা: ধরুন আগামীকাল থেকে বিশ্বে যদি পুঁজির অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে শ্রমের অবাধ চলাচল পদ্ধতি চালু হয়ে যায় তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির চেহারাটা কেমন হবে? এ রকমটি যদি হয়, তাহলে প্রতিটি দেশ আরো আরো শ্রমিক পাবার প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হবে। আর তা-ই যদি হয় তাহলে যে শ্রমিকদের আমদানি করা হবে তাদের আকর্ষিত করার স্বার্থে পুঁজিপতিকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলতে হবে: "তোমাদের মজুরি ভাল দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের মজুরি থেকে খুবই স্বল্পমাত্রায় আয়কর কাটা হবে।" আর এসব সিদ্ধান্ত যদি নেয়াই হয় সেক্ষেত্রে পুঁজির উপর উচ্চ হারে কর বসাতে হবে। এ প্রসঙ্গে জোসেফ স্টিগলিজ বলছেন, "বর্তমান বিশ্বটা এ রকম নয়, এবং অংশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেন্ট-সিকার ১ শতাংশ পরজীবীরা এমনটা চাইতে পারে না।"[৪৫]

বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতির দৃশ্যপট এখন যে রূপ নিয়েছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়: চিরাচরিত-প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ (traditional) চিন্তা দিয়ে হবে না; ঐ পথে হেঁটে লাভ হবে না; লাভ হবে নব্য-উদারবাদীদের কথা না শুনলে – আর শুনলে ক্ষতি গুণিতক হারে বাড়তেই থাকবে; লাভ হবে না এ কারণেও যে ধনী দেশ তাদের নিজ দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলাফল বিচার না করেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের পরীক্ষাগার (field of experiment অর্থে) ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে।[৪৬] আর ধনী বিশ্বের অনুকরণ করে লাভ হবে না; কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই তো রেন্ট-সিকারদের সাথে রাজনীতি ও সরকারের অশুভ সমস্বার্থ সে দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বাড়িয়েছে।

নব্য-উদারবাদী অর্থনীতি দর্শন উন্নয়নকামী-উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশসমূহকে ফর্দ দেয় যে আজকের যুগের উন্নত দেশসমূহ যেহেতু মুক্তবাণিজ্য (Free Trade) ও মুক্তবাজার (Free Market) পদ্ধতি মেনে নিয়ে ধনী হয়েছে সেহেতু তোমরাও (উন্নয়নকামী-উন্নয়নশীল-স্বল্পোন্নত-দরিদ্র দেশসমূহ) ঐ পথ মেনে নিয়ে উন্নত-ধনী হতে পারো; উন্নত-ধনী হতে হলে মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজারের কোনো বিকল্প নেই। আসলে নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনবিদেরা যে

[৪২] বিস্তারিত দেখুন, Stiglitz, Joseph. E, 2002. Globalization and Its Discontents, পৃ. ২৪৪-২৫২।

[৪৩] Noam Chomsky, 2003. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance, পৃ. ২৩০।

[৪৪] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, পৃ. ৬-৭ ।

[৪৫] Stiglitz, Joseph. E, 2013. The Price of Inequality, পৃ. ৭ ।

[৪৬] বিস্তারিত দেখুন, Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. পৃ. ৪৭১-৪৯২।

বলেন "আজকের যুগের উন্নত-ধনী দেশসমূহ মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতি অবলম্বনে ধনী হয়েছে" – এ কথা একেবারেই মিথ্যা; ঐতিহাসিক মিথ্যা।

আজকের যুগের উন্নত-ধনী দেশসমূহের ধনী হবার পিছনে ঐতিহাসিক সত্যটা তারা যা বলেন সে রকম নয়। ঐতিহাসিক সত্য হলো এ রকম: প্রথমত, আজকের ধনী দেশসমূহ অতীতে ধনী ছিল না। তাদের ধনী হবার পিছনে মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য নীতি-কৌশল নয় দেশাত্ববোধসম্পন্ন চেতনার সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশলই (protectionist policies and strategies, অথবা যাকে অনেকেই বলেন nationalist policies) প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে ধনী হবার এ প্রক্রিয়ায় কাজ করেছে অর্থনৈতিক সংরক্ষণবাদ, ভর্তুকি (প্রণোদনা হিসেবে) এবং সরকারি হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-উদ্দিষ্ট মিশ্র নীতি-কৌশল। দ্বিতীয়ত, এক কালের গরিব দেশসমূহ ধনী হবার পরে তারা "উপরে ওঠার মই লাথি মেরে সরিয়ে ফেলে দিয়েছে" ("kicking away the ladder") এবং গরিব দেশগুলোকে উপরে ওঠার মই ছাড়াই মুক্তবাণিজ্য ও মুক্তবাজার নীতি-কৌশল অবলম্বনে বাধ্য করছে। আসলে আজকের যুগের ধনী দেশসমূহের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রধানত তাদের শিল্প অর্থনীতি (industrial economy অথবা economy of manufacture) সংরক্ষণে আমদানি পণ্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক (high tariff) আরোপের ইতিহাস। যাকে এক কথায় বলা হয় "সংরক্ষণবাদ" অর্থাৎ "protectionism"।

এ নিয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে আজকের উন্নত-ধনী দেশসমূহের উন্নত বা ধনী হবার পেছনের ইতিহাস হলো "সংরক্ষণবাদ"। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উন্নত-ধনী দেশ যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এসব দেশের কোনোটারই ধনী হবার পিছনে নব্য-উদারবাদীদের মুক্তবাণিজ্য বা মুক্তবাজার মতবাদ কাজে লাগেনি, উল্টো – কাজে লেগেছে বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশজ শিল্প সুরক্ষা ও তা বিকশিত করার পথ-পদ্ধতি যেখানে রাষ্ট্র (রাষ্ট্রীয় বা সরকারি হস্তক্ষেপ) প্রধানতম ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমেই দেখা যাক এক কালের গরীব পরে ধনী হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাস। রিপাবলিকান পার্টির আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পরপরই মুক্তবাজার-বিরোধী অবস্থান নিয়ে সমসাময়িক ইতিহাসে শিল্পপণ্য আমদানির উপর সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করেন,[৪৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত আমদানি পণ্যের উচ্চ শুল্ক হার (tariff on manufacture) – ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ বহাল ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। ১৯১৩ সালে ডেমোক্রাটদের জয়ের পর প্রক্রিয়াজাতকৃত শিল্পপণ্যের আমদানি শুল্ক কিছু সময়ের জন্য ৪৪ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) ঐ শুল্কহার আবার বাড়ানো হয় এবং ১৯২১ সালে রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় আসার পর তা আরও বাড়ানো হয়; ১৯২৫ সালে ঐ শুল্কহার ৩৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়। আর মহামন্দার সময় ১৯৩০-এর দশকে আমদানি শুল্ক আরও বাড়িয়ে ৪৮ শতাংশে উন্নীত করা হয়। সমগ্র উনবিংশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে মার্কিন অর্থনীতি ছিল একই সাথে অতি-সংরক্ষণবাদী (উচ্চ আমদানি শুল্ক হারসহ অন্যান্য সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল) এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন। অবশ্য মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের (অর্থাৎ নব্য-উদারবাদীদের) কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে সংরক্ষণবাদ নীতির আওতায় মার্কিন অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির কারণ সংরক্ষণবাদ নয় কারণ দ্রুত প্রবৃদ্ধির "অন্যান্য উপাদানের" উপস্থিতি, যেমন যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার এবং স্বাক্ষরতার উচ্চ হার।[৪৮] এসব প্রতিযুক্তি দুর্বল কারণ পৃথিবীর অনেক দেশই দ্রুত প্রবৃদ্ধির "অন্যান্য উপাদান"-এর অনুপস্থিতিতে সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল প্রয়োগে ধনী হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে আছে জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স, জাপান, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া।

উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক তখন থেকেই নিজ দেশে বাণিজ্য উন্মুক্ত করে এবং বৈশ্বিক মুক্তবাণিজ্যের প্রবক্তা হয়ে ওঠে যখন তার "শিল্প শ্রেষ্ঠত্ব" (industrial supremacy) পাকাপোক্তভাবে চ্যালেঞ্জহীন-অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয় অর্থাৎ ঠিক

[৪৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬০ সালে রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণায় "সংরক্ষণবাদী" নীতি সম্পর্কে কিছু বলেননি। কারণ ডেমোক্রাটদের অনেকেই তার দলে যোগ দেয় যারা ছিলেন দাস প্রথা-বিরোধী এবং মুক্তবাজার পন্থী; আব্রাহাম লিঙ্কন তখন ভঙ্গুর দলকে সংহত রাখার কাজে ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার সাথে সাথে তিনি "আমেরিকান সিস্টেম" তত্ত্বের প্রবক্তা তৎকালীন হুইগ পার্টির নেতা হেনরি ক্লেই-এর তত্ত্বকেই আমেরিকার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক পথনির্দেশক বলে মনে করেন এবং তা প্রয়োগ করেন। হেনরি ক্লেই-এর "আমেরিকান সিস্টেম" তত্ত্বের মূল কথা হলো : (১) আমেরিকার দেশজ শিল্প– প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (manufacturing industries) রক্ষা করতে হবে; এবং (২) অবকাঠামো বিনির্মাণে প্রচুর বিনিয়োগ করে "অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন" নিশ্চিত করতে হবে (যার মধ্যে অন্যতম অবকাঠামো ছিল নদী পথ ও ক্যানাল খনন)।

[৪৮] দেখুন, Irwin.D. 2002, Review of H-J. Chang, Kicking Away the Ladder– Development Strategy in Historical Perspective (Anthem Press, London, 2002), http://eh. net/bookreviews/library/0777.shtml.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে (১৯৪৫ সালের পরে)। কিন্তু ব্রিটেন যেমন তার মুক্তবাণিজ্য সময়কালে (১৮৬০-১৯৩২) যে মাত্রায় মুক্তবাণিজ্য চর্চা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও সে হারে করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনও ব্রিটেনের মতো শূন্য আমদানি শুল্কহার ছিল না; যখনই প্রয়োজন পড়েছে তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগ্রাসী সংরক্ষণবাদী অশুল্ক বাধা (non tariff barriers)[৪৯] প্রয়োগ করেছে। এখানেই শেষ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বাণিজ্য উদারীকরণের দিকে (নিরঙ্কুশ মুক্তবাণিজ্য নয়) অগ্রসরমান ঠিক সে সময়েই মার্কিন সরকার নিজ দেশে মৌল-নিয়ামক শিল্প বিকাশে "গবেষণা ও উন্নয়ন" (Research and Development) খাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়নে নিয়ামক প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "গবেষণা ও উন্নয়ন" খাতে মোট দেশজ বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে ফেডারেল সরকার (ব্যক্তি খাত নয়), আর ঠিক একই সময়ে সরকার পরিচালিত (government-led) জাপান ও কোরিয়ায় এ হার ছিল বড়জোর ২০ শতাংশ। অর্থাৎ মার্কিন ফেডারেল সরকারের ঐ বিনিয়োগ ছাড়া বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও প্রযুক্তিগত নেতৃত্বে আসতে সক্ষম হতো না – যেখানে "গবেষণা ও উন্নয়ন" খাতে সরকারি বিনিয়োগই ছিল প্রধান, এবং ঐ বিনিয়োগের মূল ক্ষেত্র ছিল কম্পিউটার, সেমি কন্ডাকটর, ইন্টারনেট, মহাশূন্য বিজ্ঞান ও প্রাণ বিজ্ঞান (life sciences)। এতক্ষণ যা বললাম তা কোনো অর্থেই নব্য-উদারবাদীদের মুক্তবাণিজ্য, মুক্তবাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষণ নয়।

'সংরক্ষণবাদ' অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য যদি খারাপই হবে তাহলে ইতিহাসে বিশ্বের দুই সফল ও সবল ধনী অর্থনীতি – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কেন অত বেশি সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল অবলম্বন করল? এখানেই শেষ নয়। অন্যান্য ধনী দেশ যেমন ফ্রান্স, জার্মানি এবং জাপানের শুল্ক দেয়াল অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভেদ্য হলেও সংরক্ষণবাদের অন্যান্য অনেক মাপকাঠিতে অনেক দুর্ভেদ্য। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গড় শুল্ক হার (average tariff rate) এক কথা আর নির্দিষ্ট শিল্পে উচ্চ শুল্ক হার ভিন্ন কথা।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের শুরুতে জার্মানি, সুইডেন ও বেলজিয়াম-এ গড় শুল্ক হার কম থাকলেও (যা থেকে মনে হতে পারে তারা মুক্তবাজার চর্চা করছে) কৌশলগত কিছু শিল্পে তারা উচ্চ শুল্কহার আরোপ করে প্রকৃতপক্ষে সুস্পষ্ট সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল অবলম্বন করেছে। সমসাময়িককালে জার্মানে লোহা ও স্টিল শিল্পে, সুইডেনে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এবং বেলজিয়ামে টেক্সটাইল ও লোহা শিল্পে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা হতো। আর শিল্পায়নের শুরুর দিকে আজকের ধনী দেশের অনেকেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল – এসব কোনো অর্থেই নব্য-উদারবাদী মতবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান খুলে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মসমূহকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে (যেমন দক্ষ-প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি সরবরাহ করে) প্রকৃত অর্থে পাবলিক-প্রাইভেট ধরনের যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এ পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছিল জার্মানির শিল্পায়ন নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রুশিয়ায় লোহা, স্টিল ও বস্ত্র শিল্প; জাপানে স্টিল, জাহাজ ও রেলওয়ে শিল্প; সুইডেনে রেলওয়ে, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও জলবিদ্যুৎ খাত। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে (১৯৪৫ সালের পরে) বেশির ভাগ ধনী দেশেই শিল্প প্রবৃদ্ধিতে নিয়ামক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাপের পরিবর্তন হয় ফ্রান্সে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্সে মনে করা হতো যে সুদীর্ঘ কাল মুক্তবাজার চর্চা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক স্থবিরতার জন্য দায়ী। সেই সাথে এমনও মনে করা হতো যে এ স্থবিরতাই ফরাসিদের দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়েরও কারণ। যে কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ফরাসিরা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ বছর মেয়াদি নির্দেশনামূলক পরিকল্পনা (indicative plan) প্রণয়ন করল, প্রধান মৌল-কৌশলিক শিল্পসমূহকে জাতীয়করণ করল, কৌশলগত শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ শুরু করল, এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত শিল্পের শুল্কহার তুলনামূলক উচ্চস্তরে নির্ধারণ করল। নব্য-উদারবাদের বিপরীতে সংরক্ষণবাদী এ নীতি-কৌশল এমনই কাজে লাগল যে ১৯৮০-র দশক নাগাদ ফরাসি অর্থনীতি প্রযুক্তির অনেক খাত-ক্ষেত্রেই বৈশ্বিক নেতৃত্বে চলে আসল।

আর জাপানের অর্থনীতি শুল্কহারের নিরিখে নয় রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণবাদী প্রতিষ্ঠান 'মিটি' (Ministry of International Trade and Industry) এবং 'জেটরো' (Japan External Trade Organization)-এর সম্মিলিত সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদে প্রাচুর্যহীন তুলনামূলক দরিদ্র দেশ থেকে জাপান উন্নত-ধনী দেশে রূপান্তরিত হলো । জাপানে 'মিটি' –

[৪৯] মার্কিন অর্থনীতিতে প্রয়োগকৃত এসব আগ্রাসী অশুল্ক বাধার মধ্যে আছে সফল বিদেশি রপ্তানিকারকদের বিরুদ্ধে "স্বেচ্ছাসেবক" রপ্তানি প্রতিবন্ধকতা (যেমন, জাপানের গাড়ি কোম্পানি); মাল্টি ফাইবার চুক্তির আওতায় বস্ত্র-কাপড় আমদানির কোটা; কৃষি ভর্তুকি (এর সাথে ব্রিটেনের শস্য-আইন বাতিল পাশাপাশি দেখা যেতে পারে); এন্টি ডাম্পিং কর (মার্কিন আইনে ডাম্পিংকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তা বিদেশি কোম্পানির স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়; এ সম্পর্কে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধান দেখা যেতে পারে)।

শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় (শিল্প শুল্ক হার বাড়িয়ে নয়) সরকারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আনাগোনা কঠোর নিয়ন্ত্রণ করে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর একই সাথে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে (যা দিয়ে যন্ত্রপাতি কেনা যাবে অথবা প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রাপ্তি বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা যাবে) রপ্তানি বৃদ্ধি করেছে। দেশজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন ছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভর্তুকি প্রদান এবং সরকারের দিক থেকে তথ্য ও বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রাপ্তি। আর শেষের এ কাজটি করেছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'জেটরো'। সমসাময়িক কালে শিল্প সংরক্ষণ ও শিল্প বিকাশে জাপানের সরকার সব ধরনের মৌল-কৌশলিক শিল্পে "ভর্তুকি ঋণ" (subsidized credit) প্রদান করেছে; বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে; বেশির ভাগ মৌল-কৌশলিক শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে এবং যেসব গুটিকয়েক ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছিল সেখানে বিদেশিদের মালিকানা হতে পারত সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ, ঐসব কোম্পানি প্রযুক্তি হস্তান্তরে বাধ্য ছিল, একই সাথে উৎপাদন উপাদানের এক সুনির্দিষ্ট অংশ/অনুপাত তারা জাপান থেকে নিতে বাধ্য ছিল (যাকে বলে "local contents requirement")। আর এসবের পাশাপাশি বিদেশ থেকে জাপানে আনা প্রযুক্তি যেন সেকেলে না হয় অথবা অতি-মূল্যায়িত না হয় বিষয়টি জাপানের সরকার শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। সুতরাং এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢালাও মুক্তবাজার নীতি নয় বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলিক-প্রায়োগিক সংরক্ষণবাদই প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইতালি, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড-এর অর্থনীতি তুলনামূলক বেশ পশ্চাৎপদ ছিল এবং এ অবস্থায় তাদের দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল। ঐতিহাসিক সত্য এই যে ইতালি, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত শিল্পোন্নয়নে ফ্রান্স ও জাপানের মতোই সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল (আদৌ নব্য-উদারবাদী মুক্তবাণিজ্য, মুক্তবাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা নয়) অবলম্বন করেছিল। এদের সবাই দেশজ শিল্পায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল; এদের সবাই ১৯৬০-এর দশকের শেষ সময় নাগাদ আমদানি পণ্যের উপর উচ্চ শুল্কহার আরোপ করেছিল। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ায় সরকার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ব্যাংক ঋণ প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। ফিনল্যান্ড বৈদেশিক বিনিয়োগ শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ইতালির অনেক জায়গায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ফার্মের উৎপন্ন পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা উন্নয়ন ব্যয়ভার বহনের দায়িত্বে ছিল স্থানীয় সরকার।

এতক্ষণ যা বললাম তার বিপরীতে নব্য-উদারবাদী গোঁড়ামির মূল ফর্মুলা হলো: "মুক্তবাণিজ্য ভাল", "মুক্তবাজার স্ব-স্বার্থ বিকাশের মাধ্যমে সকলের স্বার্থ রক্ষা করে", "মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা উদ্ভাবন-সহায়ক", "মুক্তবাজার-মুক্তবাণিজ্য-মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা কাজের ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়, যা ফলশ্রুতিতে সম্পদ বাড়ায়, যেটাই পরবর্তীতে পুনঃবন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং উন্নয়ন ফল চুইয়ে পড়ার মাধ্যমে বৈষম্য-অসমতা হ্রাস করে"। আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাস এসবের পক্ষে কোনো যুক্তিই প্রদর্শন করে না। এতক্ষণ আজকের উন্নত ধনী দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইতিহাস নিয়ে যা বললাম তাতে তো এসব স্পষ্ট।

নব্য-উদারবাদের মুক্তবাণিজ্যের প্রেসক্রিপশনে যদি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবার কথা তাহলে সে আদর্শ দেশটি হতে পারে ল্যাতিন আমেরিকার মেক্সিকো। কারণ মেক্সিকোর ভৌগলিক সীমানা ঘিরে আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাজার – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ১৯৯৫ সাল থেকে মেক্সিকো উত্তর আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (NAFTA, North American Free Trade Agreement; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে চুক্তি) স্বাক্ষরকারী দেশ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকোর বংশোদ্ভূত বিশাল সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন যারা অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারেন; এবং অন্যান্য স্বল্পোন্নত-উন্নয়নকামী দেশের তুলনায় মেক্সিকোর আছে দক্ষ-প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি, যোগ্য ব্যবস্থাপক এবং তুলনামূলক উন্নত ভৌত অবকাঠামো (রাস্তা, সমুদ্রবন্দর, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি)।

মেক্সিকোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মুক্তবাণিজ্য-এর প্রবক্তা নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদেরা যুক্তি দেখান যে 'নাফটার' আওতায় মুক্তবাণিজ্যের সুফল প্রাপ্তির ফলে মেক্সিকোর অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বিষয়টি ঘোলাটে সত্য, নিরঙ্কুশ সত্য নয়। কারণ মুক্তবাণিজ্যভিত্তিক 'নাফটা' চুক্তির পরে ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে মেক্সিকোর মাথাপিছু জিডিপি বছরে ১.৮ শতাংশ হারে বেড়েছে, যেটা ১৯৮৫-১৯৯৫ সময়কালে অর্থাৎ 'নাফটা' চুক্তির আগের দশ বছরে ছিল মাত্র ০.১ শতাংশ।[৫০] কিন্তু 'নাফটা' চুক্তির আগের মেক্সিকোও তো ছিল বাণিজ্য উদারিকৃত অঞ্চল। সুতরাং অতি স্বল্পমাত্রার

[৫০] Weisbrot. M. et al. 2005, "The Scorecard on Development; 25 Years of Diminished Progress" (ছক ১)।

০.১ শতাংশ হারের প্রবৃদ্ধির জন্যও মুক্তবাণিজ্য দায়ী। মেক্সিকোর অর্থনীতিতে আরও গুরুত্ববহ সত্যগুলো এ রকম: ১৯৮০-১৯৯০-এর দশকে বিস্তৃত বাণিজ্য উদারীকরণের ফলে আমদানি প্রতিস্থাপনকারী শিল্পায়ন-উদ্ভূত (import substitution industrialization) শিল্প-কারখানায় ধ্বস নেমেছে, ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে, মানুষ কাজ হারিয়েছে, মজুরি কমে গেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিতে ভর্তুকি দেবার ফলে (বিশেষত শস্যে) মেক্সিকোর কৃষিতে বিপর্যয় ঘটেছে; ২০০১-২০০৫ সময়কালে মাথাপিছু আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার ছিল মাত্র ০.৩ শতাংশ, এর বিপরীতে আমদানি প্রতিস্থাপনকারী শিল্পায়নের "খারাপ সময়" – ১৯৫৫-১৯৮২ সময়কালে মেক্সিকোর মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল বছরে গড়ে ৩.১ শতাংশ হারে[৫১] (অর্থাৎ 'নাফটা'র সময়কালের চেয়ে অনেক বেশি হারে)।

এতক্ষণ যা বললাম তা থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসই স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, নব্য-উদারবাদের মুক্তবাণিজ্য, মুক্তবাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্ঠার বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশলই সেসব পথ-পন্থা যা আজকের উন্নত ধনী দেশসমূহের জন্য "উন্নয়ন মই" (ladder of development) হিসেবে কাজ করেছে। আর উল্লিখিত এসবই যদি নির্মোহ সত্য হয় সেক্ষেত্রে আজকের উন্নত-ধনী বিশ্বের ধনী হবার উন্নয়ন ইতিহাসের নিরিখে বলা যায় যে নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন অর্থনীতিশাস্ত্রে শুধু 'দর্শনের দারিদ্র্যই' নির্দেশ করে না তা প্রয়োগিক বিচারে উন্নয়নকামী-স্বল্পোন্নত-উন্নয়নশীল-দরিদ্র দেশসমূহ থেকে "উন্নয়ন মই সরিয়ে ফেলে" (kicking away the development ladder) উন্নয়নে বাধা সৃষ্টিকারী ধনী বিশ্বের অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের অশুভ উদ্দেশ্য ও হীনম্মন্যতা নির্দেশ করে। এ এক অশুভ বিদ্যাভিমান! জ্ঞানশাস্ত্রে "ভৌগলিক কর্তৃত্ব-আধিপত্য"-এর নিরিখে এসবকে একধরনের "পাশ্চাত্যাভিমান" বললে তেমন দোষের কিছু নেই।

তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশের আপাতত সর্বশেষ ধারা নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রের মতবাদ ও ঐ মতবাদের প্রয়োগফল বিশ্লেষণে যা দাঁড়াল সেটা নিম্নরূপ:

১. আজকের উন্নত দেশসমূহ তাদের নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়নে সমসাময়িককালে কখনও নব্য-উদারবাদী মতবাদ গ্রহণ করেনি, বিপরীতে নিরঙ্কুশ সংরক্ষণবাদী নীতি (absolute protectionist policies) অবলম্বনে তারা উন্নয়নের আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

২. ঐ সব উন্নত দেশ এখনও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কায়দা-কৌশলে নিজ দেশে সংরক্ষণবাদী নীতি-কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে।

৩. উন্নত-ধনী দেশসমূহ এক মেরুর অসম প্রতিযোগিতার (non level playing field) বিশ্বে তাদের স্ব-স্বার্থ সংরক্ষণ ও তা বিকাশে অন্যদের (যারা স্বল্পোন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নকামী) বাধ্য করছে তা করতে যা তারা নিজেরা নিজের দেশে গ্রহণ করেনি, যা তারা নিজেরা মেনে চলেনি। সাম্রাজ্যবাদী ধনী বিশ্ব স্বল্পোন্নত-উন্নয়নকামী বিশ্বকে মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা (laissez faire, laissez passer) ও পুঁজির অবাধ চলাচল মানতে বাধ্য করছে এবং সে লক্ষ্যে এখন তারা বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজারবিধি, ব্যবসায় বাণিজ্যবিধি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে প্রণয়ন করছে এবং দরিদ্র বিশ্বের দারিদ্র্যের সুযোগে তাদের এসব মানার সব ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, করছে, এবং প্রতিহত না করলে ভবিষ্যতেও করবে।

৪. উল্লিখিত কারণেই নব্য-উদারতাবাদী অর্থনীতিশাস্ত্রকে নির্দ্বিধায় পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসত্বের নগ্ন দর্শন হিসেবে অভিহিত করলে আদৌ কোনো অত্যুক্তি হবে না। নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিশাস্ত্র এবং তার প্রায়োগিক বিধি-বিধান অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্যই' শুধু নয় 'দর্শনের চরম দারিদ্র্য' নির্দেশ করে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। যত দ্রুত ততই মঙ্গল। অন্যথায় যারা এ দর্শনের বিক্রেতা-সরবরাহকারী (ধনী দেশ) এবং যারা এ দর্শনের ক্রেতা-ভুক্তভোগী ভোক্তা (দরিদ্র দেশ) দীর্ঘ মেয়াদে উভয়েরই ক্ষতি-বিপর্যয় অনিবার্য।

সুতরাং, অর্থনীতিশাস্ত্রে "নব্য-উদারবাদী উন্নয়ন দর্শন" এবং ঐ দর্শনের মহাবিপর্যয়কর প্রয়োগফল রোধে অর্থনীতিশাস্ত্রকেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতিশাস্ত্রের কাজ হবে আধুনিক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির

[৫১] Moreno-Brid, J.C, 2005, NAFTA and the "Mexican Economy: A Look Back on a Ten-Year Relationship", North Carolina International Law and Commerce Register, vol. 30.

অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক “নূতন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র” বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে “নূতন মানবিক উন্নয়ন দর্শন” বিনির্মাণ করা (বিষয়টি সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে)।

অধ্যায় ৬

অন্যের মৌলিক অবদান স্বীকার না করার দারিদ্র্য: অর্থনীতিশাস্ত্রীদের "মননের দারিদ্র্য"

"তারাই মুক্তচিন্তার মানুষ যারা সংস্কার এবং ভয়-ভীতি ছাড়াই তাদের নিজ বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো উপলব্ধির জন্য তাদের মনকে সন্নিবেশ করতে আগ্রহী। মনের এ অবস্থা গতানুগতিক নয়, কিন্তু, সঠিক চিন্তার জন্য এটি আবশ্যক।"

লিও টলস্টয়, ১৮২৮-১৯১০

এতক্ষণ যে পাঠক আমার এই গ্রন্থ পাঠ করছেন তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো প্রাক্‌ধারণা নেই। এত কিছু লেখার পরে কেন আমি আবার "অর্থনীতিশাস্ত্রীদের মননের/মানসিকতার দারিদ্র্য" অর্থাৎ "অন্যের মৌলিক অবদান স্বীকার না করার অথবা অস্বীকার করার দারিদ্র্য" প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে যাচ্ছি? আমার পাঠক সম্পর্কে আমার প্রাক্‌ধারণা (যে প্রতিচ্ছবি নিজেই বিনির্মাণ করে নিয়েছি) যে পাঠক আনুষ্ঠানিক অর্থে অথনীতিশাস্ত্রের মানুষ নন (যদিও আমি নিজে আনুষ্ঠানিক অর্থের অর্থনীতিবিদ)। পাঠক হয়তো বা ভাবছেন গ্রন্থকার অর্থনীতিশাস্ত্রের গুরুদের আর কত নিচে নামাবেন, আর কত ছোট করবেন? স্পষ্ট বলে রাখি প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের 'গুরুদের' নীচ-ছোট-খাটো করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই — এ নিয়ে আমি ভাবছি না। যা নিয়ে ভাবছি তা হলো যারা বড় তাদের বড়ত্ব অস্বীকার না করা আমার নৈতিক দায়িত্ব; বড়কে বড়ই বলা উচিত। এটা নির্মোহ জ্ঞানার্জনের সম্ভবত সবচেয়ে সহজ পথ। আমি সেটাই বলতে চেষ্টা করছি।

সম্মানিত পাঠক — আপনি এ গ্রন্থ পাঠে এখন যা যা ভাবছেন তা হলো সম্ভবত এ রকম:

১. আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তাদর্শনের শুরুটা সম্ভবত ধর্মযাজক টমাস বেকনকে দিয়ে ১৫৫০ সালের দিকে। আর ধর্মযাজক যেহেতু অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথা বলছেন সেহেতু শাস্ত্রটা নীতিশাস্ত্রীয়ই হবার কথা — *আপনি ঠিক ভাবছেন।*

২. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাণিজ্যবাদী-বণিকতন্ত্রীরা (অর্থাৎ মার্কেন্টাইলিস্ট) ছিলেন অর্থনীতি 'শাস্ত্রের মূল ধারা।' — *আপনি সঠিক না বেঠিক ভাবছেন তা নিয়ে আমি সন্দিহান। কারণ এ ক্ষেত্রে 'মূলধারা' হলো বইপুস্তকে এ যাবৎ যা লেখা হয়েছে সেসবের নিরিখে 'মূলধারা'। "সত্য" এবং "কল্পিত সত্য" (truth and illusion of truth) এক কথা নয়।*

৩. 'মূলধারার' পরের ধারাগুলো যথাক্রমে এ রকম: ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাণিজ্যবাদী-বণিকতন্ত্রী-বিরোধী 'ফিজিওক্রাট' আর তারপরে পুঁজিবাদের উদ্ভবকালীন ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি ("উদারবাদ" যেখানে আছেন উইলিয়াম পেটি ১৬২৩-১৬৮৭; অর্থশাস্ত্রের 'আনুষ্ঠানিক জনক' এডাম স্মিথ, ১৭২৩-১৭৯০; ডেভিড রিকার্ডো, ১৭৭২-১৮২৩; টমাস রবার্ট ম্যালথাস, ১৭৬৬-১৮৩ ইত্যাদি); এরপরে আছেন এতটা মুক্তবাজারপন্থী নন – নয়া-ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রবিশারদেরা; এর পরে আছেন পুঁজিবাদের ব্যবচ্ছেদকারী সমালোচক কার্ল মার্কস (উনবিংশ শতক); আর তারপরে আছেন কেইনসিয়, প্রতিষ্ঠানপন্থী ও আচরণবাদী ধারাসমূহ; আর সর্বশেষ বিংশ শতকে চলছে অতি প্রতিক্রিয়াশীল নয়া-উদারবাদী ধারা। সমস্যা হলো *অর্থনীতিশাস্ত্রে শাস্ত্রীয় চিন্তা-দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত পরিভ্রমণ থেকে সম্ভবত আপনার মনে হচ্ছে এসবের বাইরে আর কোনো কিছু নেই। আপনার এ ধারণা সঠিক নয়। এটাই এ অধ্যায়ে আমার বিষয়বস্তু। পাঠক – আপনি একমত হবেন নাকি আপনার মতদ্বৈততা থাকবে – এ নিয়ে, বলতে পারেন, আমি খুব চিন্তিত নই। কারণ আগেই বলেছি –*

অন্য কাউকে ছোট-নিচ করা আমার লক্ষ্য নয়; আমার লক্ষ্য বড়কে বড় বলা, সত্যকে (সে যতই অপ্রিয় হোক) স্বীকার করা। আর সে কাজটিই আমি করার চেষ্টা করছি। এ কাজটি করা অনেক কারণেই আবশ্যক। এসবের দু-একটি কারণ উল্লেখ করাও জরুরি। যেমন,

১. *বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত (এমনকি এগারো-বারো ক্লাসে অধ্যয়নরত) অর্থনীতির ছাত্রদের যদি প্রশ্ন করা হয় — অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক কে? এর উত্তরে তাঁরা বলেন — কেন এডাম স্মিথ।*

২. *অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন দার্শনিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান কী? এর উত্তরে তারা বলবেন — অর্থশাস্ত্র তো ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দির বিষয়, সুতরাং প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা দার্শনিকই ছিলেন অর্থনীতিশাস্ত্রের সাথে তাদের তেমন কোনো যোগসূত্র বই-পুস্তকে লেখা নেই। হ্যাঁ — ওদের দোষ নেই। বই-পুস্তকে লেখা নেই (ওসব বইপুস্তক কারা লিখেছেন?)।*

৩. *আরো সুনির্দিষ্ট করে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে অর্থশাস্ত্রে ইবনে খালদুন, টমাস একুইনাস, লিওনার্দ সিসমন্ডি — এদের সম্পর্কে কী জান? এক্ষেত্রে কোনো উত্তর মেলে না। তারও কারণ বই-পুস্তকে লেখা নেই (এসব বইপুস্তক কারা রচনা করেছেন, লিখেছেন?)।*

এটাই হলো প্রকৃত সমস্যা। এসবের কোনো কিছুই অর্থনীতির শিক্ষার্থীদের সমস্যা নয়; সমস্যা অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে যা তারা পঠন-পাঠন করছেন সেখানে; সমস্যা যারা ওসব লিখে চলেছেন তাদের মধ্যে; সম্ভবত অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থপ্রণেতারা (সাধারণ পাঠ্যবই থেকে শুরু করে অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার দর্শন পর্যন্ত) হয় এসব জানেন না অথবা সত্য-স্বীকারে অপারগ অথবা সত্য স্বীকারে প্রস্তুত নন।

আসা যাক সরাসরি প্রসঙ্গে। বলা হয়ে থাকে যে অর্থশাস্ত্রের জনক হলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভবকালীন অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ (স্কটিশ) নীতিশাস্ত্রী উদারপন্থী - 'ধ্রুপদী' অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) যিনি "বাজারের অদৃশ্য হাত" (invisible hand of market), 'মুক্তবাজার'; 'মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা', 'অবাধ বাণিজ্য', "শ্রমবিভাজন, বিশেষায়ন", ও অথনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা'-র কথা বলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় জনক হয়েছেন (বই পুস্তক তাই বলে)।

'অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক' এডাম স্মিথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ এসব কথা বলেছেন অর্থনীতিশাস্ত্রীয় দর্শনের "An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations" (সংক্ষেপে বলা হয় The Wealth of Nations, or TWON) শীর্ষক অমর গ্রন্থে, ১৭৭৬ সালে। এখানে প্রশ্ন — এডাম স্মিথ "The Wealth of Nations"- এ যা বলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয়জনক বনে গেলেন এসব কথা যুক্তিসিদ্ধভাবে এর আগে আর কেউই কি বলেননি?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হলো — বলেছেন। বলেছেন এডাম স্মিথের "The Wealth of Nations" প্রকাশিত হবার কমপক্ষে ৩৫০ বছর আগে চতুর্দশ শতকে 'মোকাদ্দিমা' গ্রন্থে — তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আরব দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)। আগেই বলেছি যেহেতু কাউকে ছোট-নিচ করার আমার কোনোই নিয়ত নেই কিন্তু নিয়ত আছে — প্রতিকূলতা সম্ভাবনা যাইই হোক না কেন — বড়কে বড় বলতেই হবে সেহেতু অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথের পাশাপাশি তাঁর ৩৫০ বছর আগের ইবনে খালদুনকে নিয়ে একটু সবিস্তার বলা প্রয়োজন। আর একই সাথে এ কথা বলা যায় যে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদি নিয়ে যাদের নাম বলা হয় আর যাদের নাম বলা উচিত অথচ বলা হয় না — এ প্রসঙ্গে। আশা করি সত্য উদ্‌ঘাটনের স্বার্থে পাঠক একটু ধৈর্য্য ধারণ করবেন।

অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রধান উদ্‌গাতা বা প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সাধারণত কাদের নাম বলা হয় অর্থাৎ কাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং একই বিষয়ে কাদের নাম বলা হয় না অর্থাৎ স্বীকৃতি দেয়া হয় না (অন্তত অর্থনীতিশাস্ত্রের বহুল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসহ সংশ্লিষ্ট গবেষণা গ্রন্থে) — বিষয়টি এ মুহূর্তে — একালে তুলনামূলক বিচারে এক ধরনের "অপ্রিয় চ্যালেঞ্জ"। আর তাই প্রথমেই অর্থনীতিশাস্ত্রের মৌলিক বিষয়াদি (পদ, ধারণা, প্রপঞ্চ) সহজবোধ্য করার জন্য মূল বিষয়টি একটি ছকে (দেখুন ছক ২) দেখানোর চেষ্টা করেছি অর্থনীতিশাস্ত্রের প্রধান বিষয়াদিকে কে কোন সময়ে প্রথম সূত্রবদ্ধ করেছেন বলে বলা হয়ে থাকে (ছক ২-এর ২ নং কলাম), আর একই বিষয়ে অনেক আগে গভীর বিশ্লেষণধর্মী কথাবার্তা বলে থাকলেও কাকে আদৌ-স্বীকৃতি দেয়া হয় না অথবা বলা চলে কখনও কখনও কেউ হালকা স্বীকার করে থাকেন মাত্র (ছক ২-এর ৩নং কলামে)। আর তারপরেই অর্থশাস্ত্রে "মননের দারিদ্র্য" বিষয়ের গুরুত্বের কারণেই একটু বিস্তারিত বলবার চেষ্টা করছি।

ছক ২: অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে যাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং যাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় না (বিষয়, নাম ও সময়কাল)

অর্থশাস্ত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ	পাঠ্যপুস্তকে যাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়	পাঠ্যপুস্তকে যাদের স্বীকৃতি নেই অথবা স্বীকৃতি প্রদানে স্পষ্ট ঘাটতি আছে
১. অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু (Subject matter of economics)	এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) জন স্টুয়াট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) আলফ্রেড মার্শাল (১৮৪২-১৯২৪) লায়নেল রবিনস্ (১৮৯৮-১৯৮৪) পল স্যামুয়েলসন (১৯১৫-২০০৯)	জেনোফোন (খ্রি.পূ. ৪৩০-৩৫৪) চাণক্য (অর্থশাস্ত্র) (খ্রি.পূ. ৩৫০-২৭৫) এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২) আল্ গাজালি (১০৫৮-১১১১) নাসির আল-দিন আল্-তুসি (১২০১-১২৭৪) স্যার জেমস্ স্টুয়ার্ট (১৭১৩-১৭৮০)
২. শ্রম বিভাজন (Division of labor); বিশেষায়ণ (Specialization)	এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)	জেনোফোন (খ্রি.পূ. ৪৩০-৩৫৪) প্লেটো (খ্রি.পূ. ৩৮০-৩৬০) ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)
৩. মুক্তবাজার (Free market), অবাধ বাণিজ্য (Free trade)	ডাড্লি নর্থ (১৬৪১-১৬৯১) বার্নার্ড দ্যা ম্যান্ডেভেইল (১৬৭০-১৭৩৩) ভ্যাঁসো দ্যা গুরনে (১৭১২-১৭৫৯) এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)	ফান লি (তাও ঝু খং) (খ্রি.পূ. ৫১৭-) কনফুসিয়াস (খ্রি.পূ. ৫৫১-৪৭৯) থমাস ম্যান (১২৬৫-১২৭৪) জোসিয়া চাইল্ড (১৬৬৮)
৪. মূল্য (Value) - মূল্যের শ্রম তত্ত্ব (Labor theory of value)	উইলিয়াম পেটি (১৬২৩-১৬৮৭) এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)	জন লক (১৬৮৯)
- ন্যায্য মূল্য (Just price)	এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০)	থমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪)
- মূল্য ভারসাম্য (Price equilibrium)		ইবনে তাইমিইয়াহ (১২৬৩-১৩২৮)
- মূল্যস্ফীতি (Inflation)		জ্যাঁ বোডিন (১৫৩০-১৫৯০)
৫. অর্থ (Money) - অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (Quantity theory of money) - বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ (Money as medium of exchange) - অর্থের ঋণতত্ত্ব (Money as credit)		প্লেটো (খ্রি.পূ. ৩৮০-৩৬০) ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) নিকোলাস দ্য ওয়েসমে (১৩৮৯-১৪৫৯) নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)
৬. খাজনা ও কর (rent, tax)	ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)	আবু ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮) আল্ গাজালি (১০৫৮-১১১১)
৭. সরবরাহ বিধি ও সরবরাহ-সাইড অর্থনীতি	জ্যাঁ-বাতিস্ত সেঁই (১৭৬৭-১৮৩২) আর্থার ল্যাফার (১৯৪০-)	ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)
৮. ভোগ ও ভোগ হ্রাস (consumption and underconsumption)	জন মেইনার্ড কেইনস্ (১৮৮৩-১৯৪৬)	বার্থেলেমি-দ্য-ল্যাফেমাস (১৫৪৫-১৬১২) চার্লস ডেভেনান্ট (১৬৫৬-১৭১৪) থমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) থরসস্টেইন ভেবলেন (১৮৯৯)
৯. সুখ ও উপযোগিতা (Happiness and utility) প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস	জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২)	এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২)
১০. দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য/ভারসাম্যহীনতা (Long term equilibrium/ disequilibrium)	এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)	থমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪) লিওনার্দ সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২) জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮৪৮)
১১. আন্তর্জাতিক বাজার সুবিধা (তত্ত্ব) (International trade/ market)	ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)	ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) ডেভিড হিউম (১৭৭০)
১২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস (Sources of economic growth)		ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) ফিলিপ ভন্ হরনিক (১৬৪০-১৭১২) ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪)

উৎস: অর্থশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস পাঠে গ্রন্থকারকর্তৃক বিনির্মিত। এ ছক অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাস পুর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করে না। তবে যে বক্তব্য প্রমাণে এ ছক নির্মাণ করা হয়েছে অর্থাৎ কোন মৌলিক বিষয়ে কাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় না অথবা স্বীকৃতিটা আংশিক এসব বিষয়ে যথেষ্ট মাত্রায় দিকনির্দেশক এবং ইঙ্গিতবহ। যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সাল উল্লেখ করা হয়েছে তা যে সনে/সালে মৌলিক কর্মটি সম্পাদিত (ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশিত হয়েছে) সেটা নির্দেশ করে।

অর্থনীতিশাস্ত্রে অন্যের অবদান স্বীকার না করার দারিদ্র্য অথবা "অর্থশাস্ত্রীদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্য" প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আগেই মোটা দাগে স্পষ্ট বলে রাখি যে পাঠ্যপুস্তকে বলা হয় এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মর্মার্থ নিয়ে বলেছেন ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে এডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল, আলফ্রেড মার্শাল, লায়নেল রবিন্স প্রমুখ অথচ প্রকৃত অর্থে এদেরও কমপক্ষে দুই হাজার বছর আগে এসব নিয়ে বলেছেন জেনোফেন, চাণক্য ও এ্যারিস্টটল (দেখুন ছক-২); বলা হয়ে থাকে যে মুক্তবাজার ও অবাধ বাণিজ্যের যুক্তি কথাও প্রথম বলা হয়েছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে কিন্তু আসলে এসব নিয়ে দুই হাজার বছর আগে যথেষ্ট মাত্রায় বিস্তারিত বলেছেন ফান লি ও কনফুসিয়াস; আর ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম মূল বিষয় শ্রম বিভাজন ও বিশেষায়ন নিয়ে নাকি প্রথম যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করেছেন অষ্টাদশ শতকে এডাম স্মিথ, কিন্তু স্মিথেরও দুই হাজার বছর আগে জেনোফেন ও প্লেটো এবং সাড়ে তিনশ বছর আগে ইবনে খালদুন যে এসব নিয়ে মৌলিক কথাবার্তা বললেন তার স্বীকৃতি কোথায় (?); মূল্য-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি "মূল্যের শ্রম তত্ত্ব" আর "ন্যায্য মূল্য" এসব নিয়ে নাকি প্রথম যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করেন সপ্তদশ শতকে উইলিয়াম পেটি (যিনি বললেন "জমি হলো সম্পদের পিতা আর শ্রম হলো মাতা") এবং অষ্টাদশ শতকে এডাম স্মিথ ("মূল্যের শ্রম তত্ত্ব") কিন্তু সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে ত্রয়োদশ শতকে থমাস একুইনাস এবং ইবনে তাইমিইয়াহ, ষষ্টদশ শতকের শুরুর দিকে জ্যাঁ বোডিন (বিশেষত মূল্যস্ফীতি বিষয়ে) এবং সপ্তদশ শতকে জন লক্ যত ধরনের মৌলিক বক্তব্য পেশ করলেন তার স্বীকৃতি কোথায়(?); অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ আর অর্থের ঋণতত্ত্ব বললে ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের অর্থনীতিবিদের কথা বলা হয় কিন্তু এসব নিয়ে দুই হাজার বছর আগে প্লেটো আর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে নিকোলাস দ্য ওয়েসমে, জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস আর ইবনে খালদুন যে মৌলিক বার্তা দিলেন সে সবের স্বীকৃতির কি হবে(?); অর্থনীতিশাস্ত্রে গর্ব-তত্ত্ব "ভারসাম্য (অথবা ভারসাম্যহীনতার) তত্ত্বের" প্রসঙ্গ আসলেই যাদের নাম উচ্চারিত হয় তারা সবাই ঊনবিংশ–বিংশ শতাব্দির কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের থমাস একুইনাস, সপ্তদশ শতকের লিওনার্দ সিসমন্ডি আর ঊনবিংশ শতকের জন স্টুয়ার্ট মিল যখন এসব নিয়ে প্রকৃতই গভীর কথাবার্তা বললেন এসবের স্বীকৃতি কোথায়(?); 'কর-শুল্ক' এসব প্রসঙ্গ এলেই পাঠ্যপুস্তকে যাদের নাম সদর্পে উচ্চারিত হয় তারা তো সবাই অষ্টাদশ শতকের অথবা পরবর্তী সময়ের অথনীতিশাস্ত্রী কিন্তু চতুর্দশ শতকের ইবনে খালদুন যখন এসব নিয়ে যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব কথা বললেন তার কি হবে(?)। অর্থনীতিশাস্ত্রে 'ভোগস্বল্পতার' (underconsumption) প্রসঙ্গ আসলেই বিংশ শতকের মহাগুরু জন্ মেইনাড কেইনসের কথা আসে কিন্তু এ নিয়ে সম্ভবত সর্বপ্রথম পঞ্চদশ শতকে বাথেলেমি-দ্য-লাফেমাস যখন প্রকৃতই বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য উত্থাপন করলেন তার স্বীকৃতি কোথায়(?)। প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে 'খাজনা ও কর'-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই যার নাম বলা হয় তিনি হলেন ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩) কিন্তু এ বিষয়ে মৌলিক অবদান যাদের তারা হলেন অষ্টম শতকের আবু ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮) ও একাদশ শতকের আল্ গাজালি (১০৫৮-১১১১) – এদের প্রসঙ্গ তেমন স্বীকৃতি পায় না। আজকাল পাঠ্যপুস্তকে "সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস" বললেই জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই (১৭৬৭-১৮৩২) এবং বিংশ শতকের আর্থার ল্যাফার (১৯৪০- ; যিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট রেগানের উপদেষ্টা)-এর কথা বলা হয় কিন্তু কেন যেন চতুর্দশ শতকের ইবনে খালদুন-এর নাম উল্লেখ করা হয় না(!)। "মুক্তবাজার" অর্থনীতির গুঢ় বিষয়াদি নিয়ে কেন যেন উল্লেখ করা হয় না ত্রয়োদশ শতকের থমাস ম্যান (১২৬৫-১২৭৪) এবং সপ্তদশ শতকের জোসিয়া চাইল্ড (১৬৬৮)-এর কথা; 'মূল্য' বিষয়ে উল্লেখ করা হয় না সপ্তদশ শতকের জন লক্ (১৬৮৯)-এর কথা; 'ভোগ' (ভোক্তার চাহিদা)-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৌলিক অবদানের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় না সপ্তদশ শতকের চার্লস দ্যাভেনান্ট (১৬৫৬-১৭১৪) এবং ঊনবিংশ শতকের থরস্টেইন ভেবলেন (১৮৯৯, যিনি Theory of Leisure Class-এর কথা বলেছেন)-এর কথা; 'অর্থনৈতিক ভারসাম্য' প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় না ঊনবিংশ শতকের জন স্টুয়ার্ট মিল এর কথা; 'আন্তর্জাতিক বাজার' প্রসঙ্গে তেমন কোনো উল্লেখ করা হয় না অষ্টাদশ শতকের ডেভিড হিউম (১৭৭০) এর কথা; আর 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি'-র কারণ-উৎস নিয়ে যাদের অবদান তেমন কোনো স্বীকৃতি পায় না তাদের মধ্যে অন্যতম চতুর্দশ শতকের ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) এবং সপ্তদশ শতকের ফ্রাঁসোয়া কেনে্ (১৬৯৪-১৭৭৪) ও ফিলিপ ভন্ হরনিক (১৬৪০-১৭১২)। (এতক্ষণ যা বললাম তার অধিকাংশই ছক-২-এ দেখানো হয়েছে)। অর্থাৎ অর্থনীতিশাস্ত্র হয় কৃপণ না হয় অনুদার অথবা অন্যের জ্ঞানবুদ্ধি স্বীকৃতি দিতে অপারগ। এসব কিছুই নির্মোহ বিজ্ঞানচেতনার নিরিখে মর্মস্পর্শী। এবং নিঃসন্দেহে অনৈতিক। এসব থেকে অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি অন্তত একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে অর্থনীতিশাস্ত্রের সাথে নীতিশাস্ত্রের দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। এ কোনো শুভ লক্ষণ নয়। কারণ চূড়ান্ত বিচারে অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয় তা নীতিশাস্ত্রজাত।

আসা যাক অর্থনীতিশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের অবদান-কথায় – যা আদৌ স্বীকৃত নয় অথবা স্বল্প-স্বীকৃত। ইবনে খালদুনের অবদান স্বীকার করেছেন সম্ভবত শুধু জোসেফ স্পিনজ্লার তার ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun" গ্রন্থে। আনুষ্ঠানিকভাবে (পাঠ্যপুস্তকে) অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক যাকে বলা হয় তিনি হলেন

ব্রিটিশ (স্কটিশ) নীতিশাস্ত্রী-অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯৪)। অথচ এডাম স্মিথের মহামূল্যবান গ্রন্থ "The Wealth of Nations" প্রকাশিত হয়েছিল ইব্নে খালদুনের মৃত্যুর ৩৭০ বছর পরে (ইবনে খালদুনের মৃত্যু সন ১৪০৬)। ইবনে খালদুন তার "আল মুকাদ্দিমা" গ্রন্থে সভ্যতার বিজ্ঞান – সভ্যতার স্তরবিন্যাস তত্ত্ব (আল্-উমরান যার অর্থ 'সমাজবিজ্ঞান') থেকে শুরু করে অর্থনীতির উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, উৎপাদন ব্যয়, মূল্য, ভোগ, উপযোগিতা – এসব সম্পর্কে যা লিখেছেন তা কোনো অর্থেই অর্থশাস্ত্রের 'প্রচলিত স্বীকৃত জনক' এডাম স্মিথের চেয়ে কম নয়। আর ইবনে খালদুন-এর বহু আগে, ২ হাজার বছর আগে ফান লি (খ্রী. পূ. ৫০০), জেনোফেন (খ্রী.পূ. ৪৩০-৩৫৪), চাণক্য (খ্রী. পূ. ৩৮৫), প্লেটো (খ্রী.পূ. ৩৮০-৩৬০) সম্ভবত এরাই প্রথম যারা অর্থনীতিতে শ্রম বিভাজন ও বিশেষায়ণের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন (সেটাও এডাম স্মিথের অবদান হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়)। এ্যারিস্টটল (খ্রী.পূ. ৩৮৪-৩২২) তো ২ হাজার বছর আগেই অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেব অর্থের ভূমিকাও বিশ্লেষণ করেছেন। এ্যারিস্টটল 'জুতার' উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে 'জুতা' পায়ে দেয়া যায় (অর্থাৎ জুতার 'ব্যবহারিক মূল্য') এবং জুতা অন্য দ্রব্যের সাথে বিনিময়ও করা যায় (অর্থাৎ জুতার 'বিনিময় মূল্য')। আর এ উদাহরণই তো পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য বুঝাতে এ্যারিস্টটলের দুই হাজার বছর পরে এডাম স্মিথ ব্যবহার করলেন। তা হলে এসব নিয়ে আদি চিন্তা কার? এখন থেকে দুই-আড়াই হাজার বছর আগে এ্যারিস্টটলের নাকি অষ্টাদশ শতকে এডাম স্মিথের? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন হবার কথা নয়। আমার এসব কথা থেকে পাঠক হয়তোবা ভাবছেন আমি ইবনে খালদুনকে প্রচলিত অর্থে অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথের তুলনায় ঊর্ধ্ব আসনে বসাতে চাইছি। হ্যাঁ-ঠিকই ভাবছেন। আমি সত্য উদ্ঘাটনে সেটাই পাচ্ছি যে এডাম স্মিথের প্রকাশিত গ্রন্থের ৩৫০ বছর আগেই ইবনে খালদুন যদি এসব লিখে থাকেন তাহলে ইবনে খালদুনকে স্বীকৃতি দেয়াটাই হবে যুক্তিসঙ্গত (ইবনে খালদুন সম্পর্কে প্রদর্শ ১২ দেখুন)। আসলে আমার লক্ষ্যটা খুবই স্পষ্ট, আমি বুঝি যে চিন্তাজগতে যেখানে যাঁর স্থান তাঁকে সেখানে স্থান দিতে কার্পণ্য করলে চিন্তাজগতের বিকৃতি ঘটে, তা ভুল বার্তা দেয় এবং চিন্তাজগৎ বিকশিত হতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান জগতে যাঁর যা স্থান তাঁকে তার স্থান দিতে হবে – এ হলো একদিকে সহজ যুক্তির কথা আর অন্যদিকে নির্মোহ জ্ঞান-বিকাশের প্রধান শর্ত।

আমি যেহেতু মনে করি চতুর্দশ শতকের ইবনে খালদুনের অর্থনীতিশাস্ত্রীয় চিন্তা অনেক গভীর এবং তা মূল্যায়িত হয়নি (বলা চলে ব্যাপকভাবে অস্বীকৃতই রয়ে গেছে) সেহেতু ঐ চিন্তার মূল বিষয়াদি আরো একটু স্পষ্ট করে বলা আবশ্যক। এ কথা মাথায় রেখে অর্থনীতিশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের মৌলিক চিন্তাসমূহ তুলনাসহ নিচে উল্লেখ করছি:

১. অর্থনীতিশাস্ত্রে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (labour theory of value) মৌলিক এক তত্ত্ব। প্রচলিত (প্রথাসিদ্ধ) সাহিত্যে বলা হয় এ তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হলেন ১৭৭৬ সনে The Wealth of Nations গ্রন্থের প্রণেতা (অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক) এডাম স্মিথ। সেইসাথে বলা হয় যে আর এ তত্ত্বকে তারপরে বিকশিত করেন ডেভিড রিকার্ডো ও কার্ল মার্কস। কিন্তু এডাম স্মিথের ঐ গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ৩৫০ বছর আগে ইবনে খালদুন (তাঁর 'মোকাদ্দিমা' গ্রন্থে) মূল্যের উৎস হিসেবে শ্রমের কথা বলেছেন এবং শ্রম ও শ্রমফলের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন (যদিও "তত্ত্ব" বলতে যা বুঝায় তিনি তা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কি না সেটা আমি বলতে পারব না)। ইবনে খালদুনের এই মূল্যের শ্রমতত্ত্বটিই কিন্তু পরবর্তীকালে দার্শনিক ডেভিড হিউম ১৭৫২ সালে তাঁর গ্রন্থ "Political Discourse"-এ ইবনে খালদুন-এর নামোল্লেখ করে লিখলেন, "পৃথিবীর সবকিছুই শ্রম দিয়ে কেনা হয়"। উল্লেখ্য যে এডাম স্মিথও কিন্তু তাঁর 'The Wealth of Nations' গ্রন্থের পাদটিকায় এ উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন। ইবনে খালদুন বলেছেন "সব মূল্যেরই উৎস শ্রম" এবং "এ শ্রমই সব আয়ের উৎস এবং পুঁজি সঞ্চয়নের উৎস।... শ্রম ও শ্রমের প্রতিফলই হলো মূল্যের সম্প্রসারণ এবং সম্পদের বৃদ্ধি"। সুতরাং অর্থনীতি সাহিত্যে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের জনক হিসেবে এডাম স্মিথের নাম বলার আগে এ ক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের অবদান নিয়ে আরো একবার ভাবা প্রয়োজন।

প্রদর্শ ১২: ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬): পুরোনাম আবদ্ আল-রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবন খালদুন আল্-হাদরামি । জন্ম তিউনিসিয়ায় এমন এক পরিবারে যেখানে ছিল সক্রিয় রাজনীতি চর্চা। তিনি পবিত্র 'কুরআন' ও ইসলামি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। উত্তর আফ্রিকায় মাগরেব অঞ্চলে সরকারি চাকরিকালীন সময়ে অনেক সরকারের উত্থান-পতন দেখেছেন। ফেজ্ শহরে কর্মরত অবস্থায় সরকার পতনের সাথে সাথে তাঁকে জেলখানায় পাঠানো হয়। মুক্তি পেয়ে দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডা শহরে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন বিচারালয়ে কাজ করেন। তবে তাঁর সংস্কার প্রস্তাব প্রত্যাখাত হলে তিনি "বেরবার উপজাতি"-দের কাছে

আশ্রয় নেন। ১৩৮৪ সালে তিনি মিশরের কায়রো শহরে বসবাস শুরু করেন। ইবনে খালদুন বহু-খণ্ডের বিশ্ব ইতিহাস "কিতাব আল-আইবার" এর রচয়িতা, যার প্রথম অংশ হলো "মুকাদ্দিমা"। তিনি মনে করতেন : একটি রাজনৈতিক সমাজের ঐক্যের ভিত্তি হলো "গোষ্ঠী চেতনা" বা "সামাজিক সংহতি" (community spirit; আরবিতে "আসাবিয়াহ্"); "গোষ্ঠী চেতনা" বা 'সামাজিক সংহতি' হলো সরকারের ভিত্তি, যা অন্যায় প্রতিরোধ করে; কিন্তু সমাজ যতই অগ্রসর হতে থাকে "সামাজিক সংহতি" ততই দুর্বল হতে থাকে এবং সরকারও ঢিলা-শিথিল হয়ে পড়ে; সরকার নিজের স্বার্থে নাগরিকদের উপর শোষণ বাড়িয়ে দেয় ফলে অন্যায্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে; ক্ষয়িষ্ণু সরকারের পতন ঘটে এবং আসে নতুন সরকার; সরকার নিজের অন্যায় ছাড়া অন্যান্য অন্যায় প্রতিরোধ করে।

উৎস: ইবনে খালদুন-এর জীবনী ও লেখনী মূলত "আল মুকাদ্দিমা" পাঠে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

২. মূল্য ও সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে বিপরীতমুখী প্রবণতার কথা বলতে গিয়ে ইবনে খালদুন 'অতিরিক্ত শ্রম শক্তি' বা 'extra effort' বা 'অতিরিক্ত এক একক শ্রম' এসব বলেছেন। এটাই কি পরবর্তীকালে অর্থশাস্ত্রে "প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা" নয়? এই শ্রম যোজন তত্ত্ব দিয়ে ইবনে খালদুন আবিষ্কার করেছেন নগরের উদ্ভব এবং ইতিহাসে সভ্যতার বিকাশ-সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব।

৩. ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তাঁর "The Principles of Political Economy and Taxation" গ্রন্থে দেখালেন যে কেন শ্রম-আয় ভিন্ন হয়। কিন্ত এর প্রায় পাঁচশ বছর আগেই তো ইবনে খালদুন দেখিয়েছেন: শ্রমই হলো আয় ও মুনাফা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় উভয় শর্ত, আর প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু প্রয়োজনীয় শর্ত; শ্রম-আয় ভিন্ন ভিন্ন হবার কারণ হলো শ্রমের দক্ষতার ভিন্নতা, বাজারের আকার-আয়তন, বাজারের স্থান-অবস্থান, কারিগরের নিপুণতা, এবং শাসক ও সরকার কী পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য (final product) ক্রয় করেন; এবং নির্দিষ্ট ধরনের শ্রম যদি অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যায়ন হয় তাহলে ঐ শ্রম উদ্ভূত পণ্যের সরবরাহের তুলনায় চাহিদা বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে ঐ পণ্য উৎপাদকের আয় বৃদ্ধি পাবে। আর নির্দিষ্ট কারিগরের উচ্চ আয় অন্যান্যদের ঐ কারিগরি ক্ষেত্রে আকর্ষণ করবে ফলে একধরনের গতিময়তা (dynamic phenomenon) সৃষ্টি হবে, যা ঐ কারিগরি শ্রম উদ্ভূত পণ্যের সরবরাহ বাড়াবে এবং সংশ্লিষ্ট আয়-মুনাফা হ্রাস করবে। এই হলো অর্থনীতিতে দীর্ঘ মেয়াদে সামঞ্জস্যের বা সমন্বয়ের (adjustment) খালদুনীয় তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাস্তবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী অর্থনীতিশাস্ত্রে এসব ছিল অন্যতম কেন্দ্রীয় চিন্তার বিষয়।

৪. একই পেশায় (অথবা শ্রম ক্ষেত্রে) একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আয় ভিন্ন হয় কেন? এ বিষয় বিশ্লেষণে এডাম স্মিথ ইংল্যাণ্ডের সাথে বাংলার (বেঙ্গল-এর) তুলনা করেছিলেন। কিন্তু অনুরূপ তুলনাতো স্মিথের ৩৫০ বছর আগে ইবনে খালদুন করেছিলেন—ফেজ ও টেলেমসেন শহর দুটিতে একই সময়ে একই পেশার আয়-ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধানে।

৫. জাতিসমূহের সম্পদ বৃদ্ধির কারণ সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণী কথাবার্তা এডাম স্মিথের ৩৫০ বছর আগে ইবনে খালদুন বলেছিলেন। ইবনে খালদুন যুক্তিসহ লিখেছেন: শ্রমই জাতির সম্পদ বৃদ্ধির উৎস; জাতির সম্পদ বাড়াতে হলে শ্রমের নিয়োজন বাড়াতে হবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে এবং বৃহদায়তন বাজারে পণ্য বিনিময় বাড়াতে হবে, (বলেছিলেন) "বৃহৎ সভ্যতা বিপুল মুনাফা সৃষ্টি করে (এবং মানুষের আয় বাড়ায়) কারণ বিপুল শ্রম নিয়োজন নিশ্চিত করে সেটাই আয়-মুনাফার উৎস"। শুধু তাই নয় মুক্তবাজার ও পছন্দের স্বাধীনতা (free market এবং freedom of choice)-র কথাও বলেছেন খালদুন। এ নিয়ে খালদুনের কথা হলো এ রকম: "মানুষের আয় বৃদ্ধি, জীবনমান বৃদ্ধি এবং সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য তাকে তার মেধা ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির স্বাধীনতা দিতে হবে। মানুষ তার প্রকৃতিপ্রদত্ত মেধা-মনন ও অর্জিত দক্ষতা দিয়ে মুক্তভাবে উচ্চমানসম্পন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম এবং এক ঘণ্টা সময়ে বেশি একক শ্রম নিয়োজন করতে সক্ষম"। এতকিছুর পরও অথনীতিশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের মৌলিক অবদান স্বীকার না করাটা যতটা না ইবনে খালদুনের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি নির্মোহ জ্ঞানজগতের প্রতি অবিচার করা হবে।

৬. পণ্যের চাহিদা, সরবরাহ, মূল্য, মুনাফা এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মৌলিকত্বে অনন্য ইবনে খালদুন। এসব নিয়ে ইবনে খালদুন বললেন, "কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা ক্রেতাকর্তৃক ঐ পণ্যের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে উপযোগিতার উপর নির্ভর করে; যে পণ্যের চাহিদা আছে তার জন্য ভোক্তার ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে ফলে ঐ পণ্য উৎপাদক কারিগরদের দক্ষতা-নিপুণতা বাড়ে। কারিগরদের দক্ষতা-নিপুণতার চাহিদা বাজারে তাঁর উৎপন্নের

চাহিদা দিয়ে নিরূপিত হয়। এসবই কারিগরদের প্রেরণা দেয়।...অপেক্ষাকৃত বেশি উর্বর ও স্বল্প উর্বর জমিতে উৎপাদিত ফসলের মূল্যও এক নয়।... যেসব উপাদান পণ্য বা সেবা মূল্য নির্ধারণ করে তার মধ্যে আছে উৎপাদন ব্যয়, ব্যক্তিগত চাহিদা, রাষ্ট্রীয় (সরকারি) চাহিদা, ভৌগলিক এলাকার (জেলা বা সমপর্যায়ের) প্রাচুর্য ও উন্নয়ন পর্যায়, সম্পদবানদের সম্পদের পুঞ্জীভবন মাত্রা, মধ্যসত্ত্বভোগী ও ব্যবসায়ীদের উপর নির্ধারিত শুল্কহার ।... বাণিজ্যের অর্থ হলো পণ্য কেনা, মজুদ করা এবং বাজারে ওঠানামার উপর ততক্ষণ অপেক্ষা করা যতক্ষণ সম্ভাব্য সর্ব্বোচ মূল্য না পাওয়া যাচ্ছে।... শহরের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা জানেন যে উচ্চমূল্যের দিকে তাকিয়ে খাদ্যশস্য মজুদ করলে অনেক সময় লোকসানও হতে পারে। মুনাফা হলো ঝুঁকি নেবার পুরস্কার।... পণ্য যখন কম এবং দুষ্প্রাপ্য তখন মূল্য বাড়ে"। এসবের পাশাপশি সম্ভবত ইবনে খালদুনই প্রথম যিনি পণ্যের সরবরাহ ও মূল্যের নিয়ামক হিসেবে উৎপাদন ব্যয়-এর বিশ্লেষণ করেন।

৭. সামষ্টিক অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি, কর-শুল্ক, অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা ও অর্থ (money) – এসব নিয়ে এখন থেকে সাড়ে ছয় শত বছর আগে (১৩৭০-এর দিকে) ইবনে খালদুন যা বলেছেন তা উল্লেখ জরুরি এ কারণে যে তিনি অর্থশাস্ত্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বীজ রোপণ করে গিয়েছেন। এসব নিয়ে খালদুন যা বলেছেন তা সংক্ষেপে এ রকম: জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন মোট চাহিদা বাড়ে তখন মোট উৎপাদন বাড়ে, মুনাফা বাড়ে, কাষ্টমস্ শুল্ক ও কর-আয় বাড়ে। এর ফলে নগরে মুনাফা গুণিতক হারে বাড়ে। (*এসবই হলো বিংশ শতকের অর্থশাস্ত্রীয় গুরু জন মেইনার্ড কেইনসের কার্যকর চাহিদা ও গুণিতক তত্ত্বের বীজ*)। জনগণের সম্পদ বাড়ে – ধন বাড়ে ।... একজন নাগরিকের ব্যয় যেহেতু অন্যের আয়, সেহেতু মোট ব্যয় মোট আয়ের সমান *(এটাই হলো জাতীয় আয় হিসেবের আধুনিক পদ্ধতি)*...। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তর হলো যাযাবরের বৃত্তি থেকে কৃষিভিত্তিক এবং তারপরে "অর্থনৈতিক বিষয়ে সহযোগিতামূলক" নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা।... অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে সরকার যেসব মাধ্যম দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তার মধ্যে আছে সরকারকর্তৃক পণ্য ও সেবা ক্রয়, এবং সরকারের কর-শুল্ক আহরণে আর্থিক নীতি ও ব্যয়-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। কিন্তু কর-শুল্ক দিয়ে রাজা যে আয় করেন তিনি যদি তা মজুত করতে থাকেন তাহলে 'গুণিতক' কাজ করবে না ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধি হবে না। অতিরিক্ত কর উন্নয়ন-প্রগতির রশি টেনে ধরতে পারে।... অর্থ (money) হলো এক ধরণের 'ঘোমটা'; অর্থ হলো মূল্য-পরিমাপক এবং মূল্য-ধারকপাত্র। সাধারণের পুঁজি সঞ্চয়নের মাধ্যম হিসেবে সোনা ও রুপা হলো গুপ্তধন ও সম্পদ কারণ এসবের দামদর বাজার উঠানামার সাথে সম্পৃক্ত নয়। এসবই বলেছেন ইবনে খালদুন এখন থেকে ৬-৭ শত বছর আগে।

উপরে অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় চিন্তাদর্শনে ইবনে খালদুনের অবদান সম্পর্কে যা বললাম তার মূল উদ্দেশ্য এ রকম নয় যে ইবনে খালদুনকে অর্থশাস্ত্রের জনক অথবা অন্যতম জনকের মর্যাদা দিতে হবে। যদিও এটা দেওয়া উচিত। কারণ ইবনে খালদুন তাঁর গভীর ইতিহাস জ্ঞান-এর সাথে তার সমসাময়িককালের মানুষ, সময় ও স্থানের সংমিশ্রণে অর্থনীতিশাস্ত্রে বিনির্মাণ করেছিলেন এক মৌলিক জ্ঞান-ভিত্তি। বিদ্যাভিমান, জাত্যাভিমানসহ অনেক কারণেই হয়তবা অর্থশাস্ত্র আপাতত এ স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু আপনারা তো দেখলেন এবং সম্ভবত বুঝলেন যে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এডাম স্মিথ ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনকের স্বীকৃতি পেয়েছেন তার বীজ রোপণ করেছিলেন স্মিথের মৃত্যুর ৩৭০ বছর আগে ইবনে খালদুন; আপনারা দেখলেন যে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের অন্যতম গুরু ডেভিড রিকার্ডো যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গুরু হয়েছেন তার ৪৫০ বছর আগে এসব বিষয়ের বীজ রোপণ করেছেন ইবনে খালদুন; আপনারা দেখলেন যে অর্থশাস্ত্রের অন্যতম গুরু জন মেইনার্ড কেইনস্ 'মোট কার্যকর চাহিদা' ও 'গুণিতক' নিয়ে যা কিছু বলেছেন এ সবেরই গভীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছেন ইবনে খালদুন কেইনসের কমপক্ষে ৫০০ বছর আগে।

এতক্ষণ যা বললাম সেসবের ভিত্তিতে আমার বক্তব্যটা এমনই সহজ-সরল যে পাঠক আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন না। আমার মূল বক্তব্যকথা চারটি:

১. অর্থশাস্ত্রের বিকাশে চতুর্দশ শতকের দার্শনিক ইবনে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬) অবদান মৌলিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি এ শাস্ত্রে যে বীজ রোপণ-বপন করেছিলেন পবরর্তীকালে অন্যেরা তা ভোগ করেছেন; কিন্তু স্বীকার করেননি (অস্বীকৃতির ঐ সংস্কৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেও আছে)।

২. অর্থশাস্ত্রে ইবনে খালদুনের এ অবদান অস্বীকার করা অথবা অনুল্লেখ করা অর্থশাস্ত্রীদের "মননের দারিদ্র্য" নির্দেশ করে।

৩. অর্থশাস্ত্রকে মোহাচ্ছন্নতা হতে মুক্তি দিতে এবং শাস্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ বিকাশ ত্বরান্বিত করতে এ শাস্ত্রে যাঁদেরই প্রকৃত অবদান আছে তাঁদের যোগ্য স্বীকৃতি দিতে হবে – যাঁর মধ্যে (অন্যদের সাথে) আছেন প্রাচীনকালের ফান লি (জন্ম খ্রি.পূ. ৫১৭); জেনোফনেস (খ্রি.পূ. ৪৩০-৩৫৪), চাণক্য (জন্ম খ্রি.পূ. ৩৫০), প্লেটো (খ্রি.পূ. ৩৮০-৩৬০); এ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২); পরবর্তীকালে মধ্যযুগের থমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪), ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), (জ্যোতির্বিদ) কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৭৩), জ্যাঁ বোর্ডিন (১৫৩০-১৫৯৬), বার্থেলেমি-দ্য-ল্যাফেমাস (১৫৪৫-১৬১৬), লিওনার্দ সিসমন্ডি (১৭৭৩-১৮৪২) প্রমুখ।

৪. এ স্বীকৃতি অর্থনীতিশাস্ত্রেরই সম্মান-সমৃদ্ধি-উচ্চতা বাড়াবে, এবং অর্থশাস্ত্রকে নির্মোহ জ্ঞান ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে।

আর আপাতত শেষ কথা: অর্থনীতিশাস্ত্র যদি নীতিশাস্ত্রই হয়ে থাকে, তাহলে এ শাস্ত্রকে অনৈতিকতামুক্ত হতে হবে; আবার এ মেলবন্ধন অর্থনীতিশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র (কারণ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নীতিশাস্ত্র আর শ্রেণিনিরপেক্ষ নেই) উভয়ের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম। ফলে বিকশিত হবে সমগ্র জ্ঞানজগৎ।

অধ্যায় ৭

অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য': কী দাঁড়াল? কী করা?

"সত্য হলো সমগ্রক। ... সত্যানুসন্ধানের সাহস হলো দর্শন চর্চার প্রথম শর্ত।"

জর্জ হেগেল, ১৭৭০-১৮৩১

উপসংহার নিয়ে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি

উপস্থিত বুদ্ধি অথবা সাধারণ জ্ঞান (common sense) বলে উপসংহারে যা থাকা সঙ্গত তা হলো – যা কিছু বলা হলো অথবা যা কিছু বলার চেষ্টা করা হলো তার মর্মকথা কী এবং আসলে কী বলার চেষ্টা করা হয়েছে-হচ্ছে-বলতে চাইছি— এসব কথা। এখন উপসংহার-এর সংজ্ঞা দেয়া আমার কথা নয়। কারণ যাকে বলে "উপস্থিত বুদ্ধি" বা "common sense" তাতো উল্লেখই করলাম, কিন্তু "common sense" নিয়ে ইতোমধ্যে আরো একটা কথা বলেছি যে "common sense is uncommon"। অর্থাৎ উপস্থিত বুদ্ধির প্রচলিত কথাবার্তা আর বিজ্ঞান অথবা যৌক্তিক কথাবার্তার মধ্যে ফারাক আছে। আর সে নিরিখেই আমার মনে হয় এ গ্রন্থের উপসংহারে কয়েকটি বিষয় থাকা উচিত হবে – হবে তা যুক্তিসঙ্গত। ঐ কয়েকটি বিষয় হলো এ রকম:

১. আসলে অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' নিয়ে এ গ্রন্থে যা কিছু বললাম তার মর্মকথাগুলো কী?

২. কেন এসব বললাম? প্রধান যুক্তিগুলো কী কী?

৩. যা বললাম তা যদি যৌক্তিক হয়, তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূর করতে করণীয় কী হওয়া উচিত?

৪. জ্ঞানশাস্ত্রের নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন কী না? প্রয়োজন হলে কী করা যেতে পারে? এ বিষয়ে সম্ভাব্য পথনির্দেশনটা কেমন হতে পারে?

অর্থনীতিশাস্ত্রে নীতি-দর্শনের দারিদ্র্য: মর্মকথাটা দাঁড়াল কী?

আনুষ্ঠানিক অর্থে অর্থনীতিবিদদের প্রথম দলের শুরুটা ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় টমাস বেকনসহ বেশ কিছু ধর্মযাজকের সমন্বয়ে। ষোড়শ শতকের এসব অর্থশাস্ত্রীর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ছিল – কীভাবে অর্থনৈতিক জীবনের নৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন করা যায়? তখন থেকে আজকের একবিংশ শতক পর্যন্ত বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ১৯৬০ দশক যখন থেকে নব্য-উদারবাদীদের উত্থান – এ সময়টুকু বাদ দিলে পিছনের ৫০০ বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র মূলত দুটি বৃহৎ বর্গের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর অনুসন্ধান করেছে: (১) সম্পদের উৎস কী? কে সম্পদের স্রষ্টা? সম্পদ কোথায় সৃষ্টি হয়? (২) বাজার ব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত? মুক্ত-অবাধ বাজার, মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা, মুক্তবাণিজ্য নাকি বাজারে ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-সম্রাট-রাষ্ট্র-সরকারের হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব থাকতে হবে? অর্থশাস্ত্রে অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে এসব বিগত ৫০০ বছরের বিষয় নয়। লিখিত হিসেবে এসব বিগত আড়াই হাজার বছরের বিষয়।

অর্থনীতিশাস্ত্রের চিন্তার ইতিহাসের বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছর উল্লিখিত দুই প্রধান বিষয়ের নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ-সর্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোতে সূত্রবদ্ধ কোনো সদুত্তর মেলেনি। সদুত্তর মেলেনি তার প্রধান কারণ সমসাময়িককালে

অর্থনীতিশাস্ত্রের এসব বিষয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর (তাঁদের) কালের ভূস্বামী-সামন্তপ্রভু-রাজা-বাদশাহ-সম্রাট-প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীসহ ঐ কালের নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণির (dominant class) শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী আজ্ঞাবাহী মাত্র। তাঁরা প্রধানত তাঁদের কালের শাসকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করেছেন – মাত্রা, ধরন এবং তীব্রতা যা-ই হোক না কেন। কেউ কেউ আবার সমকাল ছাপিয়ে আগত-সমাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করেছেন। কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন দাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন সামন্তবাদ টিকিয়ে রাখতে, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী যুগে আগত নতুন শ্রেণির, কেউ স্বার্থ রক্ষা করেছেন পুঁজিবাদের, কেউ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের, আবার কেউ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের। অধিকাংশেই তেমন যুগ-কাল নির্বিশেষে অর্থনীতি নিয়ে সার্বজনীন নির্মোহ তত্ত্ব বিনির্মাণের চেষ্টা করেননি। এসব কারণেই অর্থনীতিশাস্ত্রে 'দর্শনের দারিদ্র্য' উৎপাদিত-পুনরুৎপাদিত হয়েছে।

'দর্শন শাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ এবং তার চেতনা ও জ্ঞানের প্রক্রিয়ার মৌল বিধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তা (যাকে আমি "চিন্তা নিয়ে চিন্তা" বলেছি) বুঝায় আর 'অর্থনীতিশাস্ত্রের' কাজ বলতে যদি বুঝায় সম্পদ সৃষ্টির উৎস ও বাজার-সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদির সাধারণ সূত্রসমূহ গড়ে তোলা – সেক্ষেত্রে বিগত সাড়ে পাঁচ শত বছরের অর্থনীতিশাস্ত্র তার শাখা-প্রশাখাসহ আসলেই "দর্শনের দারিদ্র্য" নির্দেশ করে। ব্যতিক্রম শুধু কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর অর্থনীতি সাহিত্য যেখানে অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পদ্ধতিতত্ত্ব (methodology) প্রয়োগে বৈজ্ঞানিক বিধি-বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক বিশ্ববীক্ষার (social cosmology) আওতায় শুধু ঐতিহাসিক উত্তরণশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতত্ত্বই (Theory of Socio-economic Formation) আবিষ্কৃত হয়নি, যেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে যেকোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই স্থির-অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ব্যবচ্ছেদ করেছেন। মার্কসের পুঁজিবাদ বিশ্লেষণের এ কাঠামো সূত্রে নির্মোহতা আছে, সমগ্রতা আছে, বস্তুনিষ্ঠতা আছে, ঐতিহাসিকতা আছে আর সর্বোপরি আছে সর্বজনীনতা। অন্যেরা যে শ্রেণির স্বার্থরক্ষার কথা ভেবেছেন মার্কস ঠিক তার বিপরীত পক্ষের স্বার্থ রক্ষার কথা ভেবেছেন এটা ঠিক কিন্তু সে কারণে তিনি অর্থনীতিশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় 'দর্শনের দারিদ্র্য' দূর করতে পেরেছিলেন তা ঠিক নয়, যেটা সঠিক তা হলো দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে অর্থনীতিশাস্ত্র বিচার-বিশ্লেষণে তার বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ প্রয়োগ – তা না হলে মার্কস কখনও মূল্যের শ্রমতত্ত্বে পণ্যমূল্য বা পণ্য বিনিময় মূল্য নির্ধারণে বিমূর্ত শ্রমের (abstract labor) বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারতেন না (যে বিষয়টি ছিল হাজার হাজার বছর ধরে অনাবিষ্কৃত; সিরিয়াস অর্থনীতিশাস্ত্রীদের গভীর চিন্তা-দুশ্চিন্তার বিষয়; অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম সর্ববৃহৎ ধাঁধা), তা না হলে মার্কস কখনও এ উপসংহারে উপনীত হতে পারতেন না যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের অনিবার্যতার কারণে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

মার্কসের আগে ধ্রুপদী অর্থশাস্ত্রের জনক এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) অর্থশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় দর্শনকে সুসংহত-সুসংবদ্ধভাবে অন্তত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও বাজারের জটিল বিষয়াদির বিশ্লেষণ করে সূত্রবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

মার্কসের আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিশাস্ত্রের মার্কস পরবর্তী ধারাসমূহ অর্থনীতিশাস্ত্রকে 'খণ্ডিত' ও 'কামরাভুক্ত' বা 'গণ্ডিবদ্ধ' করে (fragmentation and compartmentalization) যত ধরনের উপযোগিতার তত্ত্ব (utilitarian concepts) খাড়া করা যায় তা দিয়ে ধ্রুপদী চিন্তা জগতের (classical schools) মূল্যের শ্রমতত্ত্বকেই বিসর্জন দিল। এসব করা হলো বেশ সচেতনভাবেই এবং এর ফল যা হবার তাই হলো। অর্থনীতিশাস্ত্র যুক্তির জগৎ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে নিল, ফলে শাস্ত্রের 'দর্শনের দারিদ্র্য' মহাদারিদ্র্যে রূপান্তরিত হলো।

অর্থশাস্ত্রের পশ্চাদপসারণের ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা বিশেষত সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন পরবর্তীকালে একমেরুর বিশ্বে বৈশ্বিক সব মৌল-কৌশলিক প্রাকৃতিক সম্পদে (জমি সম্পদ, জল সম্পদ, জ্বালানি-খনিজ সম্পদ, আকাশ-মহাকাশ সম্পদ) আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একক নিরঙ্কুশ মালিকানা (absolute ownership) ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ (absolute control) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রে আবির্ভূত হয়েছে নব্য-উদারবাদী মতবাদ (Neo-liberal doctrine)।

অর্থনীতিশাস্ত্রে নব্য-উদারবাদী মতবাদ কোনো সুস্থিত দর্শন নয়। আর বিশ্বে পুঁজি যখন কেন্দ্রে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদসহ পশ্চিমা ধনী দেশে উদ্বৃত্ত তখনই এ মতবাদ নতুন করে শুধু মুক্তবাজার, অবাধ বাণিজ্য, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেই ক্ষান্ত হয় না, দুনিয়া কব্জা করতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে তুলে বিশ্ববাজার, বিশ্ববাণিজ্য, বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনের মারাত্মক সব বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন রচনায় ব্যস্ত। এবং শুধু তাই

নয় ঐসব একপেশে বিধি-বিধান-নিয়ম-কানুন না মেনে চললে দুর্বলের শাস্তির বিধান তৈরিরও দায়িত্ব তাঁরা নিজে নিজেই নিয়েছেন, ফলে দুর্বল দেশের (উন্নয়নশীল, উন্নয়নকামী, স্বল্পোন্নত, 'গরীব' দেশ) সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। এ এক মহাবিপর্যয় – প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। এ অবস্থাকে বলা চলে অর্থনীতিশাস্ত্রের "রাজনৈতিক স্বেচ্ছামৃত্যু" ("political euthanasia of economics")।

বৈশ্বিক মহাবিপর্যয় রোধে অর্থশাস্ত্রের কী করার আছে?

এহেন মহাবিপর্যয় থেকে মনুষ্য সমাজকে মুক্তি দিতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য ও বিশ্ব-কব্জাকরণ প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ইতিহাসের অবসান ত্বরান্বয়নে অনেকের সাথে অর্থনীতিশাস্ত্রকেও দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় 'দর্শনের মহাদারিদ্র্য' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে – যত না শাস্ত্রের প্রয়োজনে তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্ব-জনগণের ভবিষ্যৎ প্রাগ্রসর জীবনের প্রয়োজনে। এখন অর্থনীতিশাস্ত্রের কাজ হবে চরম বৈষম্যমূলক অসম বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত নিয়ামক বিষয়াদির বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ বিশ্লেষণপূর্বক 'নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র' (New Unified Economic Science) বিনির্মাণ করে তারই ভিত্তিতে 'নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন' (New Humane Development Philosophy) প্রণয়ন যার নিহিতার্থ তথাকথিত নির্বিচার প্রবৃদ্ধি নয় অর্থাৎ – "non differentiated growth" অথবা (একই কথা) "unqualified growth" নয়। একীভূত অর্থশাস্ত্রীয় ঐ তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ একদিকে ধনী দেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতা রোধ করতে সক্ষম হবে; আর অন্যদিকে একই সাথে দরিদ্র দেশের মানবিক উন্নয়ন-প্রগতি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। এ দর্শনের লক্ষ্য হবে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট দেশের অথবা সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সিস্টেমের অথবা সুনির্দিষ্ট শ্রেণির লাভ নয় – এ দর্শনের লক্ষ্য হবে 'বৈশ্বিক প্রগতি' বা "বৈশ্বিক লাভ"। আর এ লক্ষ্যে অর্থনীতিশাস্ত্রীদের অন্যান্য অনেক কিছুর পাশাপাশি চিকিৎসাশাস্ত্রের হিপপোক্রাটিক নীতি অনুসরণে একটি শপথবাক্য (Oath অর্থে) পাঠ করা উচিত: "প্রথমকথা হলো – ক্ষতি করো না।"

বিষয়টি অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শনগত তবে সমাধান রাজনৈতিক। যেহেতু মানুষের বিবর্তনে ৯৯ শতাংশ সময়কাল কেটেছে সমতাভিত্তিক সামাজিক কাঠামোতে (আদিম সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিতে বা ব্যবস্থায়); যেহেতু মানুষ যে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাস করে তা স্থির-অনড় নয় (static নয়) তা নিয়ত পরিবর্তনশীল (dynamic) এবং শেষ বিচারে প্রগতিমুখী; যেহেতু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে উত্তরোত্তর অধিক হারে আলোকিত করতে থাকবে; এবং যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মানবশ্রম-দক্ষতাসহ উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ বিদ্যমান আপাতদৃষ্টিতে 'অসীম শক্তিধর' উৎপাদন সম্পর্ককে পাল্টে দেবে – সেহেতু প্রাকৃতিক কারণেই মানবকল্যাণকামী বৈশ্বিক এ সমাধান কোনো আপ্তবাক্য নয় – ব্যাপারটা সময়ের। জটিল এ প্রক্রিয়ার কার্যকারণ ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথনির্দেশনা দিতে হয়তো বা প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের কার্ল মার্কসের মতো 'মহাজ্ঞানী' দার্শনিকসহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) মতো 'মহাবিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানশাস্ত্রের মহাগৌরব' গিওর্দানো ব্রুনোর (১৫৪৮-১৬০০) মত নির্মোহ দার্শনিকদের সমন্বিত উদ্যোগ। কিন্তু ততক্ষণ বসে না থেকে আমাদের কাজ হবে অনিবার্য এ পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার একক ও যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখা। বিষয়টি জ্ঞানতত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক-উভয়ই।

তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা (কার্য) ক্রম কী হওয়া বাঞ্ছনীয়?

একবিংশ শতকের অর্থনীতিশাস্ত্র এখন প্রধানত "ইনস্ট্রুমেন্টাল ইকনমিকস" যেখানে অর্থনীতির নীতি নেই, নেই দার্শনিক বিষয়াদি, নেই জনকল্যাণের বিষয়াদির অগ্রাধিকার। এ শাস্ত্রে এখন যা দাপট দেখাচ্ছে তা হলো নীতি-নৈতিকতাহীন গণিতের ব্যবহার যাকে বলা চলে "প্রায়োগিক গণিতের শাখা মাত্র" (a branch of applied mathematics)। এ শাস্ত্রে এ দাপট দেখাচ্ছে নয়া-উদারবাদ যা আসলে অর্থশাস্ত্রের আদি নীতি-দর্শন থেকে বহু-যোজন দূরের। এ শাস্ত্র এখন এই শাস্ত্রের বিবর্তিত মৌলিক চিন্তাদর্শনের ধার ধারে না। এ শাস্ত্রে এখনও বাজারের অদৃশ্য হাত-ই প্রধান। এ শাস্ত্রে প্রধান বিচার্য যার ভিত্তিতেই মনে করা হয় বাজার অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ এবং যার ভিত্তিতেই অনুরূপ নীতিমালা সুপারিশ করা হয়; এখনও বিশ্বাস করা হয় প্রত্যেকের স্ব-স্বার্থকে প্রাধান্য দিলেই শেষ পর্যন্ত সবারই মঙ্গল হবে – এ বিশ্বাসের রূপ-প্রকৃতি যাই হোক না কেন অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা বিশ্লেষণে এ শাস্ত্র (বলা চলে) ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে এখন যে অর্থনীতি পাঠ করানো হচ্ছে এবং উচ্চ-উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে তার প্রকৃত মূল্য কোথায়? আসলে তেমন কোনো মূল্য নেই – স্যুট-বুট পরা কেরানি বানানো ছাড়া। এ শাস্ত্রে এখন যারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছেন তাদের যেমন ফান লি, জেনোফনেস, চাণক্য, এ্যারিস্টটল, ইবনে খালদুন, টমাস একুইনাস, টমাস মান, উইলিয়াম পেটি, এডাম স্মিথ, কার্ল মার্কস জানার প্রয়োজন পড়ে না তেমনি তাদের এখন মানুষ-সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির

বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য না জানলেও চলে। একজন অর্থনীতিবিদ 'মানুষ' নাকি যন্ত্রবিশেষ? এ প্রশ্নের সদুত্তর এখন খুব সহজ নয়!

এক সময়ের দর্শন ও নীতিশাস্ত্র থেকে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিচ্ছেদ ঘটেছে; স্থায়ী বিচ্ছেদ। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতোই অর্থনীতিশাস্ত্র এখন 'খণ্ডিত' ও 'গণ্ডিবদ্ধ' (fragmented ও compartmentalized)। অবস্থাটা এমনই যে এখন চাহিদা-সরবরাহের চিরাচরিত বিধি এবং তার সাথে সম্পর্কিত গাণিতিক মডেল প্রণয়ন-এর বাইরে বিচরণের প্রয়োজন পড়ে না। আর বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় এখন এ সবেই অতি আগ্রহী। এ এক মহা দুর্দশা! মহা বিপর্যয়! এ মহাদুর্দশা থেকে পরিত্রাণ জরুরি। এ লক্ষ্যে এ গ্রন্থে যা কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি সেসবের বিচারে আমার মনে হয় অর্থনীতিশাস্ত্রের শিক্ষা কার্যক্রমের ধরন-বৈশিষ্ট্য (curriculum) হওয়া উচিত নিম্নরূপ (আমি জানি আপাতত আমার প্রস্তাব গৃহীত হবে না, এবং এও জানি যে সময়ের সাথে সাথে আমার প্রস্তাবটি ভাবনার বিষয়ই হবে)।

আমার প্রস্তাবটি উত্থাপনের আগে আরো একটা কথা বলে রাখতে চাই। তাহলো 'অনিশ্চয়তা' (uncertainity) এবং 'ঝুঁকি' (risk) সমার্থক নয়। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে অর্থনীতি যত উপরের দিকে যাচ্ছে (প্রচলিত অর্থে 'উন্নতি' হচ্ছে) সে অর্থনীতি স্থীতিশীল (stable) করতে অথবা সে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা আনতে ও প্রবৃদ্ধি (growth) নিশ্চিত করতে অনিশ্চয়তার মাত্রা তত বেশি, এবং এ মাত্রা সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে বিনিয়োগ বাজার (investment market) এবং আর্থিক বাজারে (financial market)। আর এ দুই বাজারের অনিশ্চয়তা (uncertainity) সমগ্র অর্থনীতিকে ঝুঁকিগ্রস্থ (risk) করছে। অর্থনীতিশাস্ত্রের ব্যষ্টিক (micro economics) এবং সামষ্টিক (macro economics) – কোনো শাখাই আর এ সমস্যা পূর্ণাঙ্গ বুঝে উঠতে পারছে না (macro-micro mismatch)। তথাকথিত 'rational expectation'-সংশ্লিষ্ট অনুসিদ্ধান্ত কাজ করছে না। সম্ভবত যা কাজ করার কথা তা হলো এ রকম যে "বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে (উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতির হার, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি) স্থান-কালভেদে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত কাজ করে।"

উপরে যা বললাম এসবের নিরিখেই প্রশ্ন – তাহলে অর্থনীতিশাস্ত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার কোন পর্বে/কোন স্তরে কী কী বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে? এ নিয়ে আমি আমার প্রস্তাব (বলা যেতে পারে পুনর্গঠন প্রস্তাব) দুভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান (অনার্স) পর্বের জন্য, আর দ্বিতীয়টি মাস্টার্সসহ পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্বের জন্য। আমার প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্বের জন্য প্রস্তাব: আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তিযুক্তি হলো "অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয়, অর্থনীতিশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান"। আর তাই অর্থনীতিবিদকে যথাযোগ্য মাত্রায় জানতে হবে দর্শন, ইতিহাস, গণিত, রাষ্ট্রনীতি, মানুষের চিন্তা ও মনস্তত্ত্ব, এবং সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং অর্থনীতিশাস্ত্রে যারা প্রথম ডিগ্রি (৪ বছরের অনার্স অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তর) অর্জন করতে যাচ্ছেন, তাদের ম্যাক্রো ও মাইক্রো অর্থনীতির (যেখানে কিছুটা গণিতশাস্ত্র জানা প্রয়োজন হয়) জ্ঞান থাকাটা যথেষ্ট নয়। সমাজের জন্য উপযোগী অর্থনীতিবিদ হবার জন্য এ স্তরে যেসব বিষয়ে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক তা হলো: দর্শন (বিশেষত নীতিদর্শন), অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং রাজনীতি। অনার্স পর্বের শেষ বর্ষে কিছুটা 'বিশেষজ্ঞ' (specialist) বানানোর চেষ্টা হতে পারে তবে গণিতশাস্ত্রের ভার কিছুটা কমানো যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন শুধু গণিতের জ্ঞানের জোরে পরীক্ষায় উচ্চ স্থান দখলের (যেমন প্রথম শ্রেণি ইত্যাদি) অপ্রয়োজনীয়তা কমবে আর অন্যদিকে আমার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি 'অর্থনীতিশাস্ত্র প্রকৃতি বিজ্ঞান নয় তা নীতিশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান' – শক্তিশালী হবার ফলে এ স্তরে একজন অর্থনীতিবিদ জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ হবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স (বা পোস্ট গ্রাজুয়েট) পর্বের জন্য প্রস্তাব: উচ্চতর এ পর্বে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হলো মাইক্রো ও ম্যাক্রো ইকনমিকস পঠন-পাঠনে এখনকার তুলনায় ভিন্ন পদ্ধতি (কাঠামো) অবলম্বন করা। মাইক্রো ইকনমিকসের ক্ষেত্রে যা পড়ানো হয় তার সাথে ছোট ছোট অনুসিদ্ধান্তভিত্তিক মডেল বিনির্মাণ ও তা টেস্ট করার পদ্ধতি শেখানো এবং এটা ব্যবসা-বাণিজ্য স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করা। আর ম্যাক্রো ইকনমিকসে যারা মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একধরনের joint degree বা যৌথ ডিগ্রি-র ব্যবস্থা করা যেখানে অর্থনীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রকে মোটামুটি সমান গুরুত্ব দেয়া হবে। অর্থনীতি-বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হতে পারে দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হলো যারা ম্যাক্রো ইকনমিকস-এ মাস্টার্স বা উচ্চতর ডিগ্রি নেবেন তাদের যেন বাধ্যতামূলকভাবে দর্শন-ইতিহাস-এর শিক্ষক ও ছাত্রের সাথে interact করানো হয় (এবং ওদেরকেও ম্যাক্রো ইকনমিকস শেখানো হয়)। অর্থাৎ মাস্টার্স লেভেলে যারা ম্যাক্রো ইকনমিকসের

বিশেষজ্ঞ হবেন তাদের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন-এর উপর সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির (policy অর্থে) প্রভাব-অভিঘাত (implications) জানলেই চলবে না জানতে হবে ঐসব অর্থনৈতিক নীতিসমষ্টির সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব-নিহিতার্থ (social and ethical implications)। উচ্চতর পর্যায়ের মাইক্রো-ম্যাক্রো ইকনমিকসের এ বিভক্তি অন্যান্য সুবিধের মধ্যে আরো যে বড় ধরনের সুবিধে সৃষ্টি করতে সক্ষম তা হলো ম্যাক্রো ইকনমিস্টদের মন-মনন মাইক্রো ইকনমিকস-অভ্যাস (habit) মুক্ত করবে, এবং একই সাথে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রের পঠন-পাঠনকে নিউটনীয় একরৈখিক সূত্র থেকে মুক্ত করবে।

সুতরাং শেষ কথা হলো একদিকে সমগ্র অর্থনীতিশাস্ত্রকে শাস্ত্রীয় দর্শনের দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে হবে, আর অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও পুনর্গঠন করতে হবে। আমি এসবের উত্থাপক মাত্র। এসব নিয়ে এ মুহূর্তে তেমন কেউ ভাবছেন কী না তা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে যুক্তি থাকলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে ভাবা হবে। তখন যারা ভাববেন তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবনা চিন্তার কথা বলবেন; আরো স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেবেন। এ বিষয়ে আমি আশাবাদী। কারণ সমাজবিজ্ঞান যেখানে স্থির নয় গতিময় (not static but dynamic) সেখানে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত কোনো শাস্ত্রও স্থির হতে পারে না তাকে গতিময় হতেই হবে।

অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট দর্শন সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ

ফারুক, আবদুল্লাহ (১৯৯১). (ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড রচিত *The Age of Economist* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ) *অর্থনীতিবিদদের যুগ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বারকাত, আবুল, (২০১৬), *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল, (২০১৫), *নীতি-নৈতিকতার নিরিখে অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ: 'দর্শনের দারিদ্র্য'*। নাজেন্দা-আজিজ ট্রাস্ট বক্তৃতা ২০১৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ মে ২০১৫।

বারকাত, আবুল, (২০১২ক), *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা-২০১২, জাহানারা ইমাম স্মরণসভা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ডব্লিউভিএ মিলনায়তন, ঢাকা: ২৬ জুন ২০১২।

বারকাত, আবুল, (২০১২খ), *বাংলাদেশে দারিদ্র্য চিন্তা: ভাবনার দারিদ্র্য যেখানে প্রকট*। শাহ এ এম এস কিবরিয়া স্মারক বক্তৃতা-২০১২, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ। ঢাকা: ২৭ জানুয়ারি ২০১২।

বারকাত, আবুল (২০০৬), *একজন অদরিদ্রের দারিদ্র্য চিন্তা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, আঞ্চলিক সেমিনার। রাজশাহী: ১৫ জুলাই ২০০৬।

বারকাত, আবুল, (১৯৮৫), বিশ্ববীক্ষার বিষয়: সম্পাদকের বক্তব্য। আবু মাহমুদ রচিত *মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, ১ম সংস্করণ, খণ্ড ১*. ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মার্কস, কার্ল, (১৯৮৩), *অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

মার্কস, কার্ল, (১৯৮৮), *পুঁজি.* খণ্ড ১, অংশ ১। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

বসক রাধাগেবিন্দ (২০১৪). *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* (প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক গ্রন্থ), অখণ্ড সংস্করণ। ঢাকা: সংঘ প্রকাশনা।

ABDELAL, R., BLYTH, M., and PARSONS, C. (eds.). (2015). *Constructing the International Economy*. New York: Cornell University Press.

ALVEY, JAMES E. (2011). *A Short History of Ethics and Economics.* The Greeks. UK: Edward Elgar Publishing.

ARROW, KENNETH. J. (2008). Arrow's Theorem. In: Durlauf, S. N. and Blume, L. E. *The New Palgrave Dictionary of Economics (8 volume set)* (2nd ed.). Basingstoke, Hampshire New York: Palgrave Macmillan.

ARROW, KENNETH. J. and DEBREU, G. (2001). *Landmark papers in General Equilibrium Theory, Social Choice and Welfare*. Cheltenham, UK Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing.

ARROW, KENNETH. J. (1985a). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 5: Production and Capital*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, KENNETH. J. (1985b). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 6: Applied Economics*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, KENNETH. J. (1984). *Collected papers of Kenneth J. Arrow, volume 4: The Economics of Information*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.

ARROW, KENNETH. J. (1983). *Collected papers of Kenneth J. Arrow*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

ARROW, KENNETH. J. (1974). *The Limits of Organization*. New York: W.W. Norton & Company.

ARROW, KENNETH. J. (1970). *Essays in the Theory of Risk-bearing*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

ARROW, KENNETH. J. (1968). Economic Equilibrium. In: Merton, Robert K. and Sills, David L.(ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences (vol. 4)*. London and New York: Macmillan and the Free Press.

ARROW, KENNETH. J., SUPPES, P. and KARLIN, S. (1960). *Mathematical Models in the Social Sciences, 1959: Proceedings of the first Stanford symposium*. Stanford, California: Stanford University Press.

ARROW, KENNETH. J. (1959). Functions of a Theory of Behavior under Uncertainty. *Metroeconomica*. 11(1-2). pp.12-20. Wiley online library.

ARROW, KENNETH. J. and Hurwicz, L. (1953). *Hurwicz's Optimality Criterion for Decision Making under Ignorance*. Technical Report 6. Stanford University.

ARROW, KENNETH. J. (1951). *Social Choice and Individual Values*. New York: John Wiley & Sons, Inc ; London: Chapman & Hall.

BARKAT, ABUL. (2005). *Right to Development and Human Development: The Case of Bangladesh.* Sida and FÖreningen for SUS, Sida Auditorium, Stockholm. March 2005. Sweden: Sida and FÖreningen for SUS.

BACKHAU, JURGEN. G. (2011). *Handbook of the History of Economic Thought*. New York: Springer.

BAECK, LOUIS. (1994). *The Mediterranean Tradition in Economic Thought.* London: Routledge.

BASU, KAOSIK (2000). *A Prelude to Political Economy. Oxford: Oxford University Press.*

BAUMOL, WILLIAM. J., and BLINDER, ALAN. S. (1991). *Economics: Principles and Policy* (Fifth Edition). Harcourt Brace Jovanavich, Publications.

BEINHOCKER, ERIC. D. (2006). *The Origin of Wealth.* Evolution, complicity, and the radical remarking of economics. Boston: Harvard Business Press.

BELL, JOHN F. (1967). *A History of Economic Thought.* Second Edition. New York: The Ronald Press Company.

BENTHAM, JEREMY. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1stEdition. Oxford: Clarendon Press.

BERBER, WILLIAM . J. (2010). *A History of Economic Thought*. Connecticut: Wesleyan University Press.

BLAUG ,MARK. (1968). *Economic Theory in Retrospect*. Heinemann Educational Publishers; 2nd Revised edition. Cambridge, Cambridge University Press.

BLAUG, MARK (1997). *Economic Theory in Retrospect.* (5th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

BLOMGREN, ANNA-MARIA. (1997). *Nyliberal politisk filosofi*. En kritisk analys av Milton Friedman, Robert Nozick och F. A. Hayek. Nora: Bokforlaget Nya Doxa.

BRUE, STANLY, and GRANT, RANDY. (2012). *The Evolution of Economic Thought*. Massachusetts: Cengage Learning.

BUCHANAN, JAMES. (1775). *Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: Chicago University Press*.

CAMPANELLA, TOMMASO. (1623). *The City of the Sun (Alternate titles: La città del sole"; Latin: Civitas Solis).* Create Space Independent Publishing Platform (14 Jan 2013).

CHANG, HA-JOON. (2008). *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism.* New York: Bloomsbury Press.

CHANG, HA-JOON and GRABEL, ILENE. (2005). *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*. London: Zed Books Ltd.

CHANG, HA-JOON. (2003). *Globalization, Economic Development and the Role of the State.* London and New York: Zed Books and Third World Network.

CHARLES GIDE and CHARLES RIST. (1948). *A History of Economic Doctrine*. From the time of the physiocrats to present day. London: George G. Harrap& Co Ltd.

CHOMSKY, NOAM. (2007). *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World.*New Delhi: Viva Books Private Limited.

CHOMSKY, NOAM. (2006). *Failed States: The Abuse of Power and The Assault on Democracy.*London: Penguin Books.

CHOMSKY, NOAM. (2005). *Imperial Ambitions*. London: Penguin Books.

CHOMSKY, NOAM. (2003). *Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance.*London: Penguin Books.

COHEN, JOEL. E. (1996). *How Many People Can the Earth Support*. New York: W.W. Norton & Company.

COHN, THEODORE. (2015). *Global Political Economy*. London: Routledge.

COLANDER, DAVID. C. (2001). *Economics* (Fourth Edition). New York: McGraw Hill Irwin.

DEANE, PHYLLIS. (1989). *The State and the Economic System.* Oxford: Oxford University Press.

DEANE, PHYLLIS. (1978). *The Evolution of Economic Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press, Oct 5, 1978.

DOBB, MAURICE. (1973). *Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

EKELUND JR, ROBERT. B., and Hébert, ROBERT. F. (2013). *A History of Economic Theory and Method*. Illinois: Waveland Press.

ENGELS, FRIEDRICH. (1972). *The Origin of the Family, Private Property and the State*. New York : Pathfinder

ESSID, YASSINE (1995). *A Critique of the Origins of Islamic Economic thought*. Boston, MA: Brill Academic Publishers.

EVANS, PETER. B. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

FOURIER, CHARLES. (1971). *Design for Utopia*. New York: Schocken Books.

FOURIER, CHARLES. and POSTER, M. (1971). *Harmonian Man*. Garden City, New York: Doubleday.

FRIEDMAN, MILTON. SAVAGE, L. and BECKER, G. (2007). *Milton Friedman on economics*. Chicago: University of Chicago Press.

FRIEDMAN, MILTON. (1991). *Quantity Theory of Money*. In: Eatwell, J., Milgate, M. and Newman, P. *The New Palgrave*. New York: W.W. Norton & Company.

FRIEDMAN, MILTON. and LEUBE,KURT R. (1987).*The Essence of Friedman.* Stanford, Calif: Hoover Institution Press.

FRIEDMAN, MILTON. and FRIEDMAN, ROSE D. (1980). *Free to Choose*. New York: Harcourt Brace Jovanvich.

FRIEDMAN, MILTON. (1977). *Nobel Lecture: Inflation and Unemployment*. *Journal of Political Economy*. 85.

FRIEDMAN, MILTON. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.

FUSFELD, DANIEL. R. (1982).*The Age of the Economist*. Scott, Foresman and Company.

FUSFELD, DANIEL R. (1972). *The Rise of the Corporate State in America*. *Journal of Economic Issues*. 6(1), pp. 1-22.

GALBRAITH, KENNETH, J (1998). *A History of Economics: The Past as the Present*. London: Penguin.

GIDDENS, ANTHONY. (2003). *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge.

GORDON, DONALD. F. (1965). The Role of the History of Economic Thought in the understanding of Modern Economic Theory. *The American Economic Review*, *55*(1/2), pp. 119-127.

GRAY, ALEXANDER. (1931; 1961). *The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey*. London: Longmans, Green.

HAHNEL, ROBIN. (2015). The ABCs of Political Economy. Pluto Press: University of Chicago Press Economics Books.

HALÉVY, ÉILE. (1952). *The Growth of Philosophic Radicalism*. Reprinted. Trans. Morris, M. London: Faber and Gwyer.

HARVEY, DAVID. (2009*). Reshaping Economic Geography: The World Development Report 2009***.** The Hague: Institute of Social Studies.

HARVEY, DAVID (2007). *A Brief History of Neoliberalism.*Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, DAVID. (2006). *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development.* London: Verso.

HARVEY, DAVID. (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

HARVEY, DAVID. (1996). *Justice, Nature, and the Geography of Difference*. Cambridge, Mass.: Blackwell Publishers.

HARVEY, DAVID. (1982). *The Limits to Capital*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, FRIEDRICH. A. and HAMOWY, R. (2011). *The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, FRIEDRICH. A and KLEIN, P. (1992). *The Fortunes of Liberalism*. Chicago: University of Chicago Press.

HAYEK, FRIEDRICH. A. (1973). *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles and Political Economy.Volume 1: Rules and Order*. London: Routledge.

HAYEK, FRIEDRICH. A. (1944). *The Road to Serfdom.* Chicago: University of Chicago press.

HEGEL, FRIEDRICH. G.W. (1894). *Lectures on the Philosophy of History*.London: H. G. Bonn.

HEILBRONER, ROBERT L. (2011). *The Worldly Philosopher*. New York; Smon and Schuster.

HEILBRONER, ROBERT. (1990). Analysis and Vision in the History of Modern Economic Thought. *Journal of Economic Literature, 28*(3), pp. 1097-1114.

HUMAN DEVELOPMENT REPORT (2013). *The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*. New York: UNDP.

HUME, DAVID. (1961). *A Treatise of Human Nature*. Garden City, New York.: Doubleday.

HUME, DAVID. (1894). *An Enquiry Concerning the Human Understanding*. Oxford: Clarendon Press.

HUME, DAVID. (1752). *Political discourses*. Edinburgh: Printed by R. Fleming, for A. Kincaid and A. Donaldson.

HUNT, EMERY. K., and LAUTZENHEISER, MARK (Third Edition). (2015). *History of Economic Thought: A Critical Perspective*. New York: Routledge.

HUTCHINSON, MARJORIE. G. (2016). *Early Economic Thought in Spain 1177-1740*. Indiana: Liberty Fund.

HYMAN, DAVID. N. (1992). *Economics* (Second Edition). Homewood, IL and Boston. MA: IRWIN.

IBN KHALDUN (tr. by Franz Rosenthab, 1967). *The Mucaddimah, an Introduction to History*. Princeton: Princeton University Press.

IRWIN, DOUGLAS. (April 2004). Review of Ha-Joon Chang. (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press. http://eh-net/book_reviews/library/0777.shtml.

ISLAHI, AZIMA. (2014). *History of Islamic Economic Thought.* UK: Edward Elgar Publishing.

ISSAWI, CHARLES (1950). *An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis* (1332-1406). London: John Murray.

JEVONS, STANLEY. W. (1883). *Methods of Social Reform* and other papers, edited by Harriet A. Jevons. London: Macmillan and Co.

JEVONS, STANLEY. W. (1879). *Methods of Social Reform, II: A state parcel post*. The Contemporary Review. 34.

JEVONS, STANLEY. W. (1876). *The Future of Political Economy*. Forthnightly Review. November 1, vol. xx, pp. 617-31.

JEVONS, STANLEY. W. (1875). *Money and the Mechanism of Exchange*. New York: D. Appleton

JEVONS, STANLEY. W. (1871). *The Theory of Political Economy*. Reprint. Harmondsworth: Penguin Books.

JEVONS, STANLEY. W. (1869). *The Substitution of Similars, the True Principle of Reasoning*. London: Macmillan & Co.

JEVONS, STANLEY. W. (1866). *Brief Account of a General Mathematical Theory of Political Economy*. In Journal of the Royal Stitistical Society. vol. xxix., 29. pp. 282-287.

JEVONS, STANLEY.W. (1866). *The Coal Question.* 2d ed. London: Macmillan. Available online at: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Jevons/jvnCQ.html.

KAPLAN, STEVEN. (1976). *Bread, Politics and Political Economy in the Reign of Louis XV*. The Hague: Martinus Nijhoff.

KATES, STEVEN (2013). *Defending the History of Economic Thought.* UK: Edward Elgar Publishing.

KEYNES, MAYNARD. J. (1890). The Scope and Method of Political Economy. Ontario: McMaster University Archive for the History of Economic Thought.

KEYNES, MAYNARD. J. (1965). *A Treatise on Money*. New York: Harcourt, Brace and company.

KEYNES, MAYNARD. J. (1956). *Essays and Sketches in Biography*. New York: Meridian Books.

KEYNES, MAYNARD. J. (1940). *How to Pay for the War, a Radical Plan for the Chancellor of the Exchequer*. London: Macmillan.

KEYNES, MAYNARD. J. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money.* London: Macmillan and Co.

KEYNES, MAYNARD. J. (1931). The End of the Gold Standard .*Sunday Express,* 27 Septemper 1931.

KEYNES, J. M. (1920). *The Economic Consequences of the Peace*. New York: Harcourt, Brace, and Howe.

KEYNES, MAYNARD. J. (1926). *The End of Laissez-faire*. London: L. & Virginia Woolf.

KEYNES, MAYNARD. J. (1920). *The Economic Consequences of the Peace*. New York: Harcourt, Brace and Howe.

KEYNES, MAYNARD. J. (1915). *The Economics of War in Germany*. The Economic Journal, 25(99), p.443.

KOZUL-WRIGHT, and RAYMENT, P. (2007). *The Resistible Rise of Market Fandamentalism: Rethinking Development Policy in an Unbalanced World.* London: Zed Books and Third World Network.

KRUGMAN, PAUL. (2013). *End This Depression Now*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.

KRUGMAN, PAUL. (2007). *The conscience of a liberal*. New York: W.W. Norton & Company.

KRUGMAN, PAUL. (1994). *Peddling prosperity*. New York: W.W. Norton & Company.

KRUGMAN, PAUL. WELLS, R. and GRADDY, K. (2008). *Economics*. New York: Worth Publishers.

KUAN, LEE. Y. (2000). *From Third World to First,The Singapore Story: 1965-2000*. Marshall

LEE, FREDERIC. S. (2009). *A History of Heterodox Economics: Challenging the Mainstream in the Twentieth Century.* NY: Routledge.

LETWIN, WILLIAM. (1963). *The Origins of Scientific Economics: English Economic Thought, 1660-1776-177*. London: Methuen & Co., 1963.

LIPSEY, RICHARD. G, and CHRYSTAL, K. A. (1995, Eighth Edition). *An Introduction to Positive Economics.* ELBS: Oxford University Press.

LOCKE, JOHN. (1990). *Questions Concerning the Law of Nature*. In: Robert Horwitz et al. *Questions Concerning the Law of Nature.* Ithaca: Cornell University Press.

LOCKE, JOHN. (1969). *Two Treatises of Government.* London: C. and J. Rivington.

LOCKE, JOHN. (1692). *Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, and Raising the Value of Money*. London: Printed for Awnsham and John Churchill .

MALTHUS THOMAS. R. (1959). *Population: The First Essay*. The University of Michigan Press, Ann Arbor Books

MALTHUS, THOMAS. R. (1951). *Principles of Political Economy.* New York: Kelley.

MALTHUS, THOMAS. R. (1824). *Political Economy. Quarterly Review* 30 (60). pp. 297 –334.

MALTHUS THOMAS. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. Reprint.Oxford World's Classics.

MANDEVILLE, BERNARD. (1733). *The Fable of the Bees*. London: J. Roberts.

MANDEVILLE, BERNARD.. (1732). *An Enquiry into the Origin of Honour, and the Usefulness of Christianity in War. (By the author of The fable of the bees)*. London: Printed for John Brotherton.

MARCUZZO, MARIA. C. (2008). Is History of Economic Thought a "Serious" Subject?. *Erasmus Journal for Philosophy and Economics, 1*(1), pp. 107-123.

MARX, KARL. (1872). *Das Capital.* Hamburg: Otto Meissner.

MARX, KARL. (1867). *A Critique of Political Economy*. Reprinted.New York: Penguin Books.

MARX, KARL. and ENGELS, F. (1848). *The Communist Manifesto*. New York: Penguin group.

MAZZUCATO, MARIANA. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths.* London: Anthen Press.

MEDEMA. STEVEN G. and W.J. SAMUELS (eds.) (2013). *The History of Economic Thought*. A Reader (Second Edition), New York: Routledge.

MEDEMA, STEVEN. G. (2011). Hes Presidential Address: The Coase Theorem Lessons for the Study of the History of Economic Thought. *Journal of the History of Economic Thought, 33*(01), pp. 1-18.

MENGER, KARL. (1979). *Selected papers in Logic and Foundations, Didactics, Economics*. Dordrecht: D. Reidel Pub. Co.

MENGER, KARL. (1973). *Austrian Marginalism and Mathematical Economics. In: Hicks, J. R. and Weber,* W.(eds) *Carl Menger and the Austrian School of Economics.* Oxford: Oxford University Press.

MENGER, KARL. (1967). *The Role of Uncertainty in Economics. In: Shubik,* M. (ed.) *Essays in Mathematical Economics in Honor of O. Morgenstern*. Princeton: W. Schoellenkopf and W. G. Mellon.

MENGER, KARL. (1938). *An Exact Theory of Social Groups and Relations*. American Journal of Sociology . 43. pp. 790-798.

MENZER, CARL. (1871). *Principles of Economics*. New York: New York University Press.

MICHAEL ST. JOHN. P. (1954). *The Life of John Stuart Mill*. London: Secker & Warburg, GB (1954); New York: MacMillan.

MILBERG, WILLIAM. and WINKLER, D. (2013). *Outsourcing Economic: Global Value Chains in Capitalist Development.* Cambridge and New York: Cambridge University Press.

MILL,JAMES. S. (1848), *Principles of Political Economy* London: Longmans, Green and Co.

MISES, LUDWIG von. (1960; 1976). *Epistemological Problems of Economics*.New York: New York University Press.

MISES, LUDWIG von. (1957; 1969). *Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution*. New Rochelle, N.Y.: Arlington House.

MISES, LUDWIG von. (1949; 1966). *Human Action: A Treatise on Economics*. Chicago: Henry Regnery.

MITCHELL, WESLEY. C. (1966). *Lecture Notes on Types of Economic Theory*.New York, A. M. Kelley, 1949; monographic text.

MONROE, ARTHUR E. (1945). *Early Economic Thought: Selections from Economic Literature prior to Adam Smith.*Fifth Edition. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

MOORE, THOMAS. (1840a). *Thoughts on Mischief. Morning Chronicle,* 2 May 1840.

MOORE, THOMAS. (1840b). *Religion and Trade. Morning Chronicle,* 1 June 1840.

MORENO-BRID, J.C. et.al. (2005). *NAFTA and The Mexican Economy: A Look Back on a Ten-Year Relationship*; North Carolina International Law and Commerce Register. Vol. 30. pp. 997

MOSS, LAURENCE. S. (ed.). (2013). *Joseph A. Schumpeter: Historian of Economics: Perspectives on the History of Economic Thought*. NY: Routledge.

MURAKAMI, YASUSUKE., and YAMAMURA, KOZO. (1999). *An Anticlassical Political-Economic Analysis: A Vision for the Next Century*. California: Stanford University Press.

MURRAY, THOMAS. ([1962/1970] 2004. *Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles with Power and Market: Government and the Economy*. Scholar's Edition. Alabama: Ludwig Von Mises Institute.

NELSON, RICHARD. R., and WINTER, SIDNEY. G. (2009). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Massachusetts: The Belknap of Harvard University Press.

NEMBHARD, JESSICA. G. (2014). *Collective Courage: A History of African American Cooperative Economic Thought and Practice*. University Park, PA: Penn State Press.

NICHOLAS, GEORGESCU R. (1971). *The Entrophy Law and the Economic Process*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

NORTH, DUDLEY-S. (1691). *Discourses upon Trade*.A Reprint of Economic Tracts in 1907. Baltimore: The Johns Hopkins Press.

OATLEY, THOMAS. (2015). *International Political Economy*. London: Routledge.

OWEN, ROBERT. (1813). *A New View of Society, or, Essays on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Application of the Principle to Practice*. London: Cadell and Davies.

OWEN, ROBERT. and CLAEYS, G. (1993). *Selected works of Robert Owen*. London: W. Pickering.

PERKINS, JOHN. (2006). *Confessions of An Economic Hit Man. The shocking inside story of how America REALLY took over the world*.Lodon: Ebury Press.

PERKINS, JOHN. (2003). *Macroeconomics*. (Sixth Edition). Pearson Education, Inc.

PETTY, WILLIAM. (1691). *The Political Anatomy of Ireland*. New edition (1971). Irish Univesity Press.

PETTY, WILLIAM. (1690). *Political Arithmetic, etc.* London: R. Clâvel.

PETTY, WILLIAM. (1662). *A Treatise on Taxes and Contributions*. London: Obadiah Blagrave.

PHILLIPS, WILLIAM. A. (1958). *The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1967. In Economics*. 25. (100). pp. 283-299.

PIKETTY, THOMAS. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. The Belknap Press of Harvard University.

PLATO. (2000). *The Republic*. (Ferrari, G. and Griffith, T. Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.

POLANYI, KARL. P. (1944). (published paperback 1957). *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart Inc.

POMEROY SARAH. B. (1995). *Xenphon Oeconomicus NY*: Clarendon Press.

PONSARD, CLAUDE. (2012). *History of Spatial Economic Theory*. New York: Springer Science & Business Media.

PORTER, THEODORE (1995). *Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton*: Princeton University Press.

PRESSMAN, STEVEN (1999). *Fifty Great Economists. London and New York*: Routledge.

QUESNAY, FRANCOISE. (1758). *Tableau économique.Akademie-Verlag, 1965*; Free Press, 1817.

RAE, JOHN. (1895). *Life of Adam Smith*. New York: Kelley.

RAGHURAM, G. RAJAN. (2010). *Fault Lines: How Hidden Fractures still Threaten the World Economy*. Princeton University Press.

RICARDO, DAVID. (1817).*On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

RIMA, IRENE H. (1972). *Development of Economic Analysis. The Irwin series in economics*. Revised edition.

ROBBINS, LIONEL (2000). *A History of Economic Thought.* Princeton: Princeton University Press.

ROBBINS, LORD (1970). *The Evolution of Modern Economic Theory: and Other Papers on the History of Economic Thought.* UK: Palgrave Macmillan

ROBBINS, LORD. (1976). *Political Economy Past and Present: A Review of Leading Theories of Economic Policy*. UK: Palgrave Macmillan.

ROLL, ERIC. (1992). *A History of Economic Thought*. London: Faber and Faber Limited.

RONCAGLIA, ALESSANDRO (2005). *The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought.* Cambridge University Press.

ROTHBARD, MURRAY. N (1995). *Economic Thought Before Adam Smith*. Edward Elgar Publishing Ltd.

ROTHBARD, MURRAY. N (2006). *An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*: Classcal Economics.Vol. 2. Alabama: Ludwig Von Mises Institute.

ROVINS, LORD (2016). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. UK: Palgrave Macmillan.

RODRIK, DANI. (2011). *The Globalization Paradox*. Oxford: Oxford University Press.

ROLL, ERIC. (1956). *A History of Economic Thought*.Third edition. NJ: Prentice-Hall Englewood Cliffs.

SAAD-FILHO, A. and JOHNSTON,D. (2005). *Neoliberalism – A Critical Reader*. London: Pluto Press.

SACHS, JEFFREY. D. (2012). *The Price of Civilization: Reawakening Virtue and Prosperity after the Economic Fall*.London: Vintage Books.

SAMUELS, WARREN. J., BIDDLE, JEFF. E., and DAVIS, JOHN. B. (eds.). (2008). *A Companion to the History of Economic Thought*. New York: John Wiley & Sons.

SAMUELSON, PAUL. and BARNETT, W. (2007). *Inside the Economist's Mind*. Malden, MA: Blackwell Pub.

SAMUELSON, PAUL. and NORDHAUS, W. D. (2005). *Economics* (Eighteenth Edition). New York: McGraw Hill.

SANDMO, AGNAR (2011). *Economics Evolving: A History of Economic Thought* Princeton: Princeton University Press.

SARGENT, THOMAS J. and WALLANCE, N. (1976). Rational Expectations and the Theory of Economic Policy. *Journal of Monetary Economics.* 2.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1880; 1971). *A Treatise on Political Economy: or the Production, Distribution and Consumption of Wealth.* New York: Augustus M. Kelley.

SAY, JEAN-BAPTISTE. (1936). *Letters to Thomas Robert Malthus on Political Economy and Stagnation of Commerce*. London: G. Harding's Bookshop Ltd.

SCHUMPETER, JOSEPH. A. (1954). *A History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.

SCHUMPETER, JOSEPH. A. (1987). *Capitalism, Socialism and Democracy*, 6th edition. London: Unwin Paperbacks.

SCOTT, MEIKLE (1997). Aristotles Economic Thought. Oxford: Oxford University Press.

SCREPANTI, ERNESTO and STEFANO ZAMGNI (2005). *An Outline of the History of Economic Thought.* Oxford University Press.

SEN, AMARTYA. K. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

SEN, AMARTYA. K. (1987). *On Ethics and Economics*. Oxford: Basil Blackwell.

SMITH, ADAM. (1759). *The Theory of Moral Sentiments*. London: A. Miller.

SMITH, ADAM. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (The Wealth of Nations),* London: J.M. Dent & Sons ; New York : E.P. Dutton.

SPEN GLER, JOSEPH. J. (1964). *Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun*. In Comparative Studies in Society History. Vol 6, No. 3. (April 1964).

SPENCER, HERBERT. (1864). *The Survival of the Fittest.In: SPENCER*, H. The Principles of Biology. London:Williams and Norgate.

SPIEGEL, WILLIAM. h. (1991), 3rd ed.). *The Growth of Economic Thought*. Durham, North Carolina: Duke University Press.

SRAFFA, PIERO. (1955). *The Works and Correspondence of David Ricardo: Biographical Miscellany. Cambridge:* Cambridge University Press.

STARK, WERNER. (1944). *The Ideal Foundations of Economic Thought: Three Essays on the Philosophy of Economics (Ed. Mannheim, Karl.)*. First Edition. Oxford: Oxford University Press.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. Penguin Books.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2006). *Making Globalization Work*. London and New York: W.W. Norton and Co.

STIGLITZ, JOSEPH. E. (2013). *The Price of Inequality*. Penguin Books.

TAWNY, RICHARD. H. (1947). *Religion and the Rise of Capitalism*. New York: Harcourt, Brace Inc.

TAYLOR, OVERTON. H. (1960). *A History of Economic Thought*. New York: Mc Grow-Hill Book Co.

TODD, BUCHHOLZ, G. (2007). *New Ideas from Dead Economist; An Introduction to Modern Economic Thought*. Plume, New York: Penguin Group.

TOYNBEE, ARNOLD.J. (1935). *A Study of History*. Oxford: Oxford University Press.

TURGOT, JACQUES.A.R. (1795). *Reflections on the Formation and Distribution of Wealth.* London: Printed by E. Spragg.

TURGOT, JACQUES.A.R. and GROENEWEGEN, P. (1977). *The Economics of A.R.J. Turgot*. The Hague: Martinus Nijhoff.

TURGOT, JACQUES.A.R. and MEEK, R. (1973). *Turgot on Progress, Sociology and Eonomics*. Cambridge: Cambridge University Press.

VEBLEN, THORSTEIN. (1954). *The Theory of the Leisure Class. New York: Macmillan,*. 1899. New York: New American Library, Mentor Edition.

VEBLEN,THORSTEIN. (1904). *The Theory of Business Enterprise*. Reprint edition. New York: Charles Scribner's Sons.

VER EECKE, WILFRIED. (1998). The Concept of a "Merit Good" the Ethical Dimension in Economic Theory and the History of Economic Thought or the Transformation of Economics into Socio-economics. *The Journal of Socio-Economics, 27*(1), pp. 133-153.

VERMEIJ, GEERAT. J. (2009). *Nature: an economic history*. New Jersey: Princeton University Press.

WALRAS, LEON. and JAFFÉ, W. (1965). *Correspondence of Léon Walras and related papers*. Amsterdam: North-Holland Pub. Co.

WARSH, DAVID (2007). *Knowledge and the Wealth of Nations: A Story of Economic Discovery.* NY: W.W. Norton & Company.

WEISBROT, MARK. (2005). *The Scorecard on Development: 25 Years of Diminished Progress, Centre for Economic and Policy Research* (CEPR), Washington, DC, September 2005 (http://www.cepr.net/publications/ development 2005 09. pdf), figure 1.

WHITE, LAWRENCE h. (2012). *The Clash of Economic Ideas.* Cambridge: Cambridge University Press.

WILLIAMSON., JOHN. (1990). *What Washington Means by Policy Reform*. In: Williamson, J. (ed). Latin American Adjustment: How much Has Happened?. Washington, DC: Institute for International Economics.

নির্ঘণ্ট

অ-

অর্থনৈতিক নীতিমালা
অর্থনৈতিক পরিবর্তন
অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান
অর্থনীতিশাস্ত্রের জনক
অর্থনীতিতে নীতিশাস্ত্র
অর্থশাস্ত্র
অর্থনীতিশাস্ত্র
অর্থনীতি চিন্তা
অর্থশাস্ত্রে গণিতের ব্যবহার
অর্থশাস্ত্রের সূত্রসমূহ যথেষ্ট অনুমাননির্ভর
অর্থশাস্ত্রের বিকাশে সংশ্লিষ্ট চিন্তকদের চিন্তার অস্পষ্টতা
অর্থখাজনা
অদক্ষতা
অস্বীকার করার দারিদ্র্য
অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
অর্থের ঋণতত্ত্ব
অনৈতিক অর্থপূজা
অনুবিজ্ঞান
অপ্রাচুর্যের বিজ্ঞান
অপ্রাচুর্যের সমস্যা
অবাধ চলাচল
অবাধ প্রতিযোগিতা
অবাধ বাজার
অবাধ বাণিজ্য
অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি
অভ্যন্তরীণ বাজার
অভ্যাস
অভাব
অর্জনপ্রবণ
অস্ট্রিয়ান স্কুল
অনিশ্চয়তা
অতি উৎপাদন
অর্থনৈতিক উদারবাদ
অর্থনীতিশাস্ত্রের বিকাশ
অর্থশাস্ত্রীকদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্য
অস্বীকৃত পথপ্রদর্শক
অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
অপ্রাচুর্য-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে
অতিরিক্ত এক একক শ্রম
অতিরিক্ত শ্রম শক্তি
অতীতের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অস্বীকারের দারিদ্র্য

আ-

আইনের শাসন
আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্ব
আর্থার সেসিল পিগু
আগুনের বহুমুখী ব্যবহার
আদিম
আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা
আদিম সাম্যবাদী সমাজ
আয়ের বণ্টন

আব্রাহাম লিঙ্কন
আবুল বারকাত
আবু ইউসুফ
আবদুল্লাহ ফারুক
আমদানি অনুৎসাহিত করা
আরব-দার্শনিক
আল্ গাজালি
আলফ্রেড মার্শাল
আল্ মোকাদ্দিমা
আল্ উমরান
আকাশ-মহাকাশ
আচরণবাদী
আচরণবাদী স্কুল
আয় বণ্টন
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবাহের উপর
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ
আফ্রিকা
আসাবিয়াহ্

ই-

ইউটোপিয়া
ইকনমিক টেবিল
ইকনমিক হিটম্যান
ইতালি
ইবনে খালদুন
ইবনে তাইমিইয়াহ
ইন্দ্রিয় সুখ
ইনস্ট্রুমেন্টাল ইকনমিকস

উ-
উদারপন্থী
উদারপন্থী স্কুল
উচ্চ শুল্ক হার
উচ্চতর ডিগ্রি
উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভন্‌স
উইলিয়াম পেটি
উকিল শ্রেণি
উচিত-অনুচিত
উচিত-অনুচিতের বোধ
উপাদান-উপকরণ
উপনিবেশ
উমরান
উত্তরণ পর্বের ইস্যু
উদ্বৃত্ত
উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল-ফসল
উৎপাদন
উৎপাদন ব্যয়
উৎপাদন-ভোগ
উৎপাদনী অভিজ্ঞতা
উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ
উন্নয়ন মই
উপরে ওঠার মই
উপনিবেশ
উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব

ঋ–
ঋণাত্মক প্রভাব-অভিঘাত
ঋণাত্মক ভূমিকা
ঋণাত্মক প্রয়োগফল

এ-
একক পণ্য
এক মেরুর বিশ্বে
একচ্ছত্র আধিপত্য
একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ
একচেটিয়া ব্যবসা
একবিংশ শতকে অর্থনীতিশাস্ত্রের দর্শন
একক পণ্যের বিশ্লেষণ
এন্ত্রোনিও সেররা
এনাটোমি
এশিয়া
এ্যারিস্টটল
এডোয়ার্ড মিথেলডেন
এডাম স্মিথ

ও–
ওয়কোনোমিকাস
ওয়াশিংটন ঐকমত্য

ক-
করের ভিত্তি
কলোনি
কল্পনারাজ্য
করব্যবস্থা
কম্পিউটার
কফি
কর্তৃত্ব
কর্মসংস্থান ও আয়
কম্যুনিষ্ট ইশতেহার
কম্যুনিটি
কনফুসিয়াস
কল্যাণের বিজ্ঞান
কল্পিত সত্য
কাজের ফলপ্রদতা
কামরাভুক্ত
কার্যকর সিস্টেম
কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব
কার্ল মেন্‌গার
কার্ল মার্কস
কারিগরের নিপুণতা
কারিগর
ক্যাপিট্যাল
কেনেথ্ বোলডিং
কোপার্নিকাস
কেইনসীয়ান স্কুল
কৃষিকাজ
কৃষি ব্যবস্থাপনা
কুট পরামর্শদাতা
কুনীতিশাস্ত্র
কুর্নিশ
কিতাব আল-আইবার
কৌটিল্য
ক্রমপুঞ্জিভূত
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক প্রাপ্তি
ক্রয়বিক্রয়-প্রধান
ক্ষয়িষ্ণু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধীতা
ক্ষুদ্র ভূমিমালিক শ্রেণি
ক্ষুদ্রার্থের বিজ্ঞান

খ-
খাজনা
খাজনা তত্ত্ব

গ-
গণিত
গতির সূত্র
গার্হস্থ্য বিষয়াদি-সংশ্লিষ্ট বিদ্যা
গাণিতিক সমীকরণ
গোষ্ঠীগত
গোষ্ঠী চেতনা
গীর্জার ক্ষমতা
গ্রানাডা
গ্রিক
গিওর্দানো ব্রুনো
গৃহস্থালী
গুণিতক

ঘ–
ঘোলাটে সত্য

চ-
চণকমুনি
চয়নের স্বাধীনতা
চানক্যের অর্থনীতিশাস্ত্র
চানক্যের অর্থশাস্ত্র
চার্লস ডেভেনান্ট
চার্লর্স ফোরিয়ার
চাহিদা
চাহিদার সংকোচন
চাহিদা-সরবরাহের রেখচিত্র
চাহিদা-সরবরাহের বিধি
চাণক্য
চূড়ান্ত দ্রব্য
চীনা কনফুসিয় মতবাদ
চিরায়ত
চী

ছ–
ছন্দহীন কবিতা

জ–
জন উইলিয়াম
জন লক্
জড়বাদকে তিরস্কার
জন স্টুয়ার্ট মিল
জন মেইনার্ড কেইনস্
জন কেনেথ্ গলব্রেথ
জন পার্কিনস
জল সম্পদ
জমি সম্পদ
জমিদার
জমিদার-ব্যারন
জাপান
জার্মানি
জাত্যাভিমান
জ্যাকস তুরগো
জ্যাঁ বোর্ডিন
জ্যাঁ বাতিস্ত সেঁই
জেনোফেনস
জেরেমি বেন্থাম
জেরার্ড দ্য মলিনেস
জেরার্ড মালিনেস
জোয়েল কোহেন
জোসিয়া চাইল্ড
জোসেফ স্টিগলিজ
জ্ঞান নিয়ে আধিপত্যবাদ
জ্ঞানশাস্ত্রের গৌরব
জার্মান ভাবাদর্শ
জাতিসমূহের সম্পদ
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ
জ্যঁ বাতিস্ত কোলবার্ট
জীবনের সংহতি
জীবনমান বৃদ্ধি
জীববিজ্ঞানের সাথে তুলনা
জিনিসের দাম বাড়ানোর কূটকৌশল
জেটরো

ঝ–
ঝুঁকি

ট-
টলেমি
টমাস বেকন
টমাস মুর
টমাস রবার্ট ম্যালথাস
টমাস কাম্পানেল্লা
ট্যারিফ
টেবলু ইকনমিকা

ড–

ডাড্‌লি নর্থ
ডেভিড রিকার্ডো
ডেভিড হিউম
ড্যানিয়েল ডিফো

ঢ–

ঢালাও মুক্তবাজার নীতি

ত–

তথ্য অসামঞ্জস্য
তিউনিসিয়া
তুলনামূলক সুবিধার সূত্র

থ–

থমাস মান
থরস্‌স্টেইন ভেবলেন
থার্মোডিনামিকস
থিওডর পোর্টার
থিংক ট্যাংক

দ–

দক্ষতা
দর্শনের দৈন্য
দর্শনের দারিদ্র্য
দর্শনের মহাদারিদ্র্য
দরকষাকষি
দর্শন-সাহিত্যে উদারবাদ
দণ্ডনীতি ও যুদ্ধকৌশল নীতি
দক্ষিণ কোরিয়া
দরিদ্রমুখী আয় বণ্টন
দাম
দাস উৎপাদন ব্যবস্থা
দাস যুগ
দাসমালিক
দারিদ্র্য
দারিদ্র্য-বৈষম্য
দ্বন্দ্বমূলক
দৈব ঘটনা
দ্রব্যখাজনা
দুস্প্রাপ্য
দুস্প্রাপ্য দ্রব্য
দুর্বোধ্য গাণিতিক মডেল
দুর্নীতি
দুর্ভিক্ষ

ধ–

ধনী-দরিদ্র
ধর্মযাজক
ধর্মের সমাজবিজ্ঞান
ধ্রুপদী
ধোপদুরস্ত

ন–

নতুন মানবিক উন্নয়ন দর্শন
নতুন এক একীভূত অর্থশাস্ত্র
নয়া-উদারবাদী
নয়া-ধ্রুপদি স্কুল
নব্য-উদারবাদী
নাসির আল-দিন আল্‌-তুসি
নাফটা
নারীবাদ
নিউটনীয়-একরৈখিক-যান্ত্রিক
নিরঙ্কুশ মালিকানা
নিয়ম-কানুন
নিয়ামক বিষয়
নিয়ামক-নিয়ন্ত্রক শ্রেণি
নিয়ামক শ্রেণির স্বার্থ
নির্বিচার নীতিশাস্ত্র
নির্বিচার বিশ্বাস
নির্মোহ সত্য শ্বাশত
নিকোলাস দ্য ওয়েসমে
নিউটনিয় ভারসাম্য
নির্বোধ পণ্ডিত
নিয়ামক ক্ষমতা কাঠামোর
নীতিতত্ত্ব
নীতিতত্ত্বের প্রয়োগ
ন্যায়-অন্যায়
ন্যায্য মূল্য
নৈরাজ্যবাদী-উদারবাদ
নেদারল্যান্ডস
নীতিশাস্ত্র
নীতিশাস্ত্রীয় মানবকল্যাণ
নীতিগত বা পলিসিগত সুপারিশ
নৈতিক ভ্রান্তি

প–

পছন্দ
পদার্থবিজ্ঞান
পল স্যামুয়েলসন

পছন্দ বা নির্বাচন বা বেছে নেয়ার সমস্যা
পছন্দের বিজ্ঞান
পরিভোগ
পরিবার হবে সমাজের মৌল একক
পরিবর্তনশীল
পরিমাপ
পরিধি
পলিটিক্যাল ইকনমি
পণ্য
পণ্য মূল্য
পণ্যের দুস্প্রাপ্যতা
পণ্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক মূল্য
পণ্যের বিনিময় মূল্য নিরূপণে বিমূর্ত শ্রমের তত্ত্ব
পণ্যে নিহিত শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের প্রকৃতি
প্লেটো
পোস্ট গ্রাজুয়েট
প্যালিওজয়িক
পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র
পৃথিবী স্থির
প্রথম জীব কোষ
প্রবৃদ্ধি
প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব
প্রকৃত উৎপাদক শ্রেণি
প্রকৃতির বিধান
প্রকৃতি বিজ্ঞান
প্রায়োগিক নীতিশাস্ত্র
প্রায়োগিক ভাবনা
প্রায়োগিক-প্রেসক্রিপশন
প্রাকৃতিক অধিকার
প্রাকৃতিক বিধি
প্রকৃতির শক্তি
প্রাকৃতিক স্বাধীনতাভিত্তিক ব্যবস্থা
প্রাকৃতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা
প্রাণবিজ্ঞান
প্রতিষ্ঠানবাদী স্কুল
পুনঃবণ্টন
পুঁজিপতি
পুঁজিবাদ
পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রাকৃতিক অবসানের তত্ত্ব
পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি
পুঁজিবাদে পণ্য উৎপাদনের সর্বজনীনতার তত্ত্ব
পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা
পুঁজির সঞ্চয়ন
পুঁজিতান্ত্রিক পণ্য
পুঞ্জিভূত
পুঞ্জিভবন
পৃথিবীর সবকিছুই শ্রম দিয়ে কেনা হয়
প্রচলিত স্বীকৃত জনক
প্রায়োগিক গণিতের শাখা মাত্র
প্রান্তিক উপযোগ
প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা
প্রতিযোগিতা
পাশ্চাত্যাভিমান
পুনর্বন্টনমূলক কল্যাণরাষ্ট্র
পুঁজিবাদ
পুঁজির বাজারভিত্তিক বরাদ্দ
পুঁজি
প্রিক্যামব্রিয়ান

ফ–
ফান লি
ফটকা-অনুমানভিত্তিক উন্নয়নের
ফয়েরবাখ
ফ্যালাঞ্জ
ফ্রেডরিখ ভন হায়েক
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস
ফেজ্
ফ্রাঁসোয়া কেনে্
ফ্রান্স
ফিজিওক্রাট
ফিলিপ ভন্ হরনিক
ফিনল্যান্ড

ব–
বস্তু স্থির
বস্তুবাদী
বঞ্চনা-বিচ্ছিন্নতা
বণ্টন
বর্শা-বল্লম
বড়কে বড় বলা
বড়কে বড়ই বলা উচিত
বণিকশ্রেণি
বণিকশক্তি
বণিকতন্ত্রী
বাদশা
বাধাহীন বাজার
বার্থেলেমি দ্য ল্যাফেমাস
বার্নার্ড দ্যা মেন্ডেভেইল
বাজারের স্থান-অবস্থান
বাজারের অদৃশ্য হাত

বাজারের আকার-আয়তন
বাজার প্রথা
বাজারকে একা থাকতে দাও
বাজারই সব উৎপাদককে সজাগ করে দেয়
বাণিজ্যের ধণাত্মক ভারসাম্য
বাণিজ্যের ভারসাম্য
বাণিজ্যের বিশ্বায়ন
বাণিজ্যবাদী
বাণিজ্যিক ভারসাম্য
বাছাই করে নেয়ার বিজ্ঞান
বাজার ব্যর্থতা
বাজারব্যবস্থা কীভাবে চলা উচিত
বাণিজ্য হতে হবে অবাধ
ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব
ব্যক্তিগত প্রেরণার ফল সবার জন্যই মঙ্গলজনক
ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র
ব্যবসায়-চক্র তত্ত্ব
ব্যবহারিক মূল্য
ব্যাংক
ব্যাংকারদের কারসাজি
ব্যক্তিগত সম্পত্তি
বৃহদাকার
বেলজিয়াম
বুর্জোয়া
বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি
বেদনানাশক
বেরবার উপজাতি
ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যকেন্দ্রিক ধারণা
বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার
বিদ্যাভিমান
ব্রিটিশ
ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের যুগ
বিমূর্ত ভাল
বিশ্বব্যাংক
বিশ্ববাজার
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা
বিশ্ব-কব্জাকরণ প্রক্রিয়া
বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক অর্থনীতি
বিনিয়োগ বাজার
বিনিময়
বিনিময় মূল্যের নিগূঢ় অর্থ
বিনিময় মূল্য
বিভিন্ন মত-ধারার স্কুলের শ্রেণিবিন্যাস
বিতর্ক
বিশেষজ্ঞ
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান
বিমূর্ত শ্রম
বৈষম্য
বৈষম্য-অসমতা
বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা
বৈশ্বিক সম্পদ
বৈশ্বিক মৌল-কৌশলিক সম্পদ
বৈশ্বিক মহামন্দা
বৈশ্বিক মুদ্রা
বৈশ্বিক লাভ
বৈশ্বিক প্রগতি

ভ–

ভদ্রলোক
ভদ্রলোক শ্রেণি
ভর্তুকি ঋণ
ভাবনার দারিদ্র্য
ভারসাম্য সৃষ্টির সুযোগ
ভোগ ও ভোগ হ্রাস
ভোগস্বল্পতার
ভূস্বামী
ভ্যাঁসো দ্য গুরনে
ভারতীয় চার্বাক দর্শন
ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ বিপজ্জনক
ভর্তুকি
ভৌগলিক কর্তৃত্ব-আধিপত্য
ভৌত

ম-

মনোবিজ্ঞান
মধ্যযুগের বাণিজ্যবাদ
মধ্যসত্ত্বভোগ
মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রীয়
মনস্তাত্মিক ব্যর্থতা
মহাপশ্চাৎপদতা
মহামন্দার বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ
মহাজগতে অসংখ্য জগতের অস্তিত্ব
মজুরি
মনস্তাত্বিক পুঁজি
মননের দারিদ্র্য
মহাজ্ঞানী
মহাবিজ্ঞানী
মজুরিশ্রম ও পুঁজি
মনন-মানসিকতার দারিদ্র্য
মাস্টার্স ডিগ্রি

মাকেন্টাইলিস্ট
মানবসভ্যতা
মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা
মানবসমাজের বিবর্তন
মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কর্মকাণ্ডের আলোচনা
মানসিক বৈকল্য
মানসিকতার দারিদ্র্য
মানচিত্র
মানুষের ভোগ
মানুষের চেতনা
মার্কসবাদী স্কুল
মালিক কর্তৃক আত্মসাৎ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিপত্য
মানুষের হিস্যা
মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির
মানুষের অসীম অভাব
মেসোজয়িক
মেধা
মেধাস্বত্ব
মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণমন্ত্রী
মৌলবিধান
মোহাচ্ছন্নতা
মোক্ষলাভ
মেক্সিকো
মূল্যের শ্রম তত্ত্ব
মূল্য ভারসাম্য
মূল্যবোধ-মুক্ত
মূল্যবান ধাতু
মূল্যস্ফীতি
মূর্ত ও প্রত্যক্ষ
ম্যাক্স ওয়েবার
ম্যাক্রোইকনমিক মডেল
মুদ্রা ব্যবস্থা
মুদ্রাস্ফীতি
মুক্তবাজার
মুনাফা
মুনাফা হলো ঝুঁকি নেবার পুরস্কার
মুনাফাকেন্দ্রিক
মুলধন
মজুদ
মানবকল্যাণ
মোকাদ্দিমা
মৌমাছিদের গল্প
মূল্যের শ্রম তত্ত্ব
ম্যাক্রোইকনমিক টেবিল
ম্যাক্রোইকনমিক মডেল
মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা
মুক্ত কর্মপ্রচেষ্টা উদ্ভাবন-সহায়ক
মিনিমাল স্টেট
মিটি
মিল্টন ফ্রিডম্যান

য–

যন্ত্রপাতি
যাযাবর
যোগাযোগের ভাষা
যুথবদ্ধ জীবন
যুদ্ধবিগ্রহ
যুদ্ধের নতুন কলাকৌশল
যুদ্ধ ভাল, যদি যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা থাকে
যুক্তরাজ্য
যুক্তির জগৎ
যুক্তিশাস্ত্রের জনক
যুক্তিগত ভ্রান্তি
যুক্তিবিদ্যা
যৌথ ডিগ্রি

র–

রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া
রবার্ট হেয়লব্রোনার
রবার্ট ম্যালথাস
রবার্ট ওয়েন
রসায়নশাস্ত্র
রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা
রাজ্যশাসন প্রণালী
রাজনৈতিক অর্থনীতি
রাজনীতি-সাহিত্যে উদারবাদ
রাজনীতিবিদ
রাজপুরুষেরা করমুক্ত
রাজ-রাজরাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল অনিবার্য
রাজশক্তি
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ
রাজনৈতিক স্বেচ্ছামৃত্যু
রেন্ট সিকিং
রেন্ট-সিকার
রেখচিত্র
রাষ্ট্রীয় ঋণ

রেইনিস জাইটুং
রেগান-ইকনমিকস্ (রেগানোমিকস্)

ল–
লন্ডন
লায়নেল রবিন্স
ল্যাটিন আমেরিকা
লগ্নি ব্যবসা
লোভ
লোভী
ল্যাটিন আমেরিকা
লুই-জ্যঁ-জোসেফ-চার্লস ব্লাঙ্ক
লৌহ বিধি
লী
লিও ওয়ালরাস
লিওনার্দ সিসমন্ডি

শ–
শোষণ
শ্রেণি বিভাজন
শ্রেণি সংগ্রাম
শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা
শ্রেণি-স্বার্থগতদ্বন্দ্ব
শোষক ও শোষিতের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান
শোষণ-বিচ্ছিন্নতা-অর্থনৈতিক স্বার্থসহ শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব
শুল্ক
শাশ্বত
শ্রমশক্তি
শ্রম মজুরি
শ্রম বিভাজন
শ্রমদাতা
শ্রম-হাতিয়ার
শ্রমের বিশেষায়ণ
শ্রমিক শোষণ
শাস্ত্রীয় গুরু
শিল্প শ্রেষ্ঠত্ব
শোষণ
শিল্প-কারখানা
শিকারভিত্তিক অর্থনীতি
শৈত্যপ্রবাহ

স–
সমস্বার্থের ঐক্য
সম্রাট
সমগ্রতা
সমসাময়িক
সমাজে সম্পদ আছে অপ্রতুল
সমাজজীবন
সমাজবিজ্ঞানী
সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
সভ্যতার উন্নতি হচ্ছে পাপ কাজের ফল
সদর্পে বিচরণ
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
সমষ্টিগত
সমতাভিত্তিক বণ্টন
সরবরাহ
সরল পণ্য উৎপাদন
সরকার
সরকারি আমলা
সঙ্গত-অসঙ্গত
সাম্যবোধ
সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রায়োগিক বিজ্ঞান
সম্পদের উৎস
সম্পদের বিজ্ঞান
সম্পদের উৎসকেন্দ্রিক
সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব
সম্পত্তির উপর অধিকার
সর্বপ্রাণবাদ
সর্বজনীন
সর্বজনীনতা
সম্পদ কে সৃষ্টি করে
সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা
সম্পত্তির সার্বজনীন মালিকানা শ্রেয়
সমাজ সমালোচক
সরকারের ব্যর্থতা
সহজ মুদ্রা নীতি
সংরক্ষণবাদ
সরকারি হস্তক্ষেপ উৎপাদন হ্রাস করে
সামাজিক সংহতি
সাধারণ দারিদ্র্য
সাপ্লাই সাইড ইকনমিকস
সামাজিক সংহতি
সাধারণ জ্ঞান
সাধারণ সূত্র
সাধারণ বিধি
সার্বভৌমত্ব
সার্বজনীন
সাম্যবাদ
সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা

সাম্য-সমতা
সাম্রাজ্যবাদ
সাম্রাজ্যবাদী
সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য
সামন্তপ্রভু
সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা
সামষ্টিক
সেনাবাহিনী
সেবাদাসত্বের নগ্ন দর্শন
সৌরমণ্ডল
সৌরজগতের বর্তমান সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা
সেমি কন্ডাকটর
সূর্যই হলো কেন্দ্র
সংগ্রহবৃত্তিক কর্মকাণ্ড
সুনীতি বোধ
সুনীতিশাস্ত্র
সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য
সুইডেন
সুপার-ডুপার
সুর-সঙ্গীত বিজ্ঞান
সুখ ও উপযোগিতা
সুখ-আকাঙ্ক্ষা
সুখপাঠ্য
স্ব-স্বার্থ
স্বল্পোন্নত
স্বভাবজাত
স্বার্থপর
স্বাক্ষরতার উচ্চ হার
স্থাপনাকাল
স্থীতিস্থাপকতার বিধান
স্কটল্যান্ডের দার্শনিক-নীতিশাস্ত্রিক
সূর্য নগরী
সৃষ্ট সম্পদ কীভাবে কাদের মধ্যে বণ্টন হয়
সিভিটাটিস সলিম
সিনোজয়িক
স্বৈরাচারী

হ–

হস্তক্ষেপপন্থী মতবাদ
হাবার্ট সাইমন
হাভার্ট দ্যাভেনপোর্ট
হামো এরিকটাস
হায়দার আলী খান
হেগেল
হোলোসিন

A
a branch of applied mathematics
A Contribution to the Critique of Political Economy
A Treatise on Political Economy
absolute control
absolute control and command
absolute ownership
absolute protectionism
abstract good
abstract labor
access
alienation
An Inquiry into Principles of Political Economy
An Inquiry into the Nature and Causes of
anarcho-liberalism
Applied ethics

B
business cycle

C
capital account
capitalism as a system of universal commodity production
Capitalistic production as a whole
choice
Circulation
Classical Political Economy
collecive life
collectionist activities
commodities
community spirit
compartmentalised
competition
consumption
contraction of demand
Critique of Political Economy

D
Das Capital
deprivation
Discourse upon Trade
Discipline
division of labour
dominant class
dominant power structure
Dual nature of labor embodied in a commodity
dynamic
dynamic phenomenon

E
easy money policy
economic sociology
Economics is the science of choice
efficiency
equality
ethical science
ethics
exchange
extended reproduction
extra effort

F
factors of production
Feminism
field of experiment
final product
Francois Quesney
freedom of choice

G
general law
general poverty
Geocentric concept of universe
Golden age of Liberalism
government intervention
growth

H
habit
Happiness and utility
Heliocentric concept of universe
History of Economic Thought
hunting economy

I
IMF
income-distribution
industrial supremacy
Inflation
information asymmetry
innovation
instrument of labor
intellectual fraud
intellectual property right
intervention
interventionist doctrine

investment market
invisible hand of market

J
Just price

L
Labor Theory of Value
ladder of development
laissez faire, laissez passer
Law of Comparative Advantage
Law of diminishing marginal return
Leberalism in Philosophy
Leberalism in Politics
Liberalism
liberty
logical fallacy

M
Man makes himself
manor
market
methodology
mindset poverty
Money as credit
moral fallacy
moral science

N
natural science
Neo-liberal
Neo-liberalism
Neuroeconomics
New Humane Development Philosophy
New Principles of Political Economy
New Unified Economic Science
Newtonian equilibrium
Newtonian linear-mechanistic
no barriers
no tariffs
not natural science

O
Oeconomicus
Oiko
Oikonomi
over production

P
philosophy of poverty
Physiocrat
Political Arithmetic
Political Discourse
political euthanasia of economics
poverty of not recognizing the past knowledge
poverty of philosophy
poverty of thoughts
Prescriptive instrumental economics
price
Price equilibrium
primary strategic resources
Principle of marginal utility
Principles of Political Economy
Principles of Political Economy and Taxation
production
protectionism
psychological capital
psychological failure
pure science

Q
Quantity theory of money

R
rent in cash
rent in kind

S
scarcity
scope
self-interest
simple commodity production
Social Critic
Socio-economic Formation
sociologist
sociology of religion
specialization
specific poverty
speculation-led development
stage setting matters
static
subsidized credit
supply-side conomics
surplus
System of natural liberty

T
Tableu economique
tax base
The Age of the Economist
The Fable of the Bees
The Political Anatomy of Ireland
The Wealth of Nations
The World Bank
Theory of Abstract Labor
Theory of Choice
Thought
Theory of ethics
trade globalization
truth and illusion of truth

U
uncertainity
underconsumption
unqualified growth
Utopian Socialism

V
value-free

W
wealth
Wealth of Nations
World Trade Organization